আমাদের লক্ষ্য ও কর্তব্য

শ্রীযুক্ত অরুণদেব ভট্টাচার্য মহাশয় অতি যত্নের সঙ্গে যথাসম্ভব সাবলীন ভাষায় বইটির বঙ্গানুবাদে প্রয়াসী হয়েছেন।

ইতিপূর্বেও উক্ত গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন রচনাগুলি চয়ন করে **'ঈশ্বর এবং ধর্ম কেন ?', 'ভগবৎ প্রাপ্তির পথ ও পাথেয়', 'কল্যাণ প্রাপ্তির উপায়', 'কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি'** প্রভৃতি নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং সেগুলি পাঠকমহলে যথেষ্ট সমাদৃতও হয়েছে। বর্তমান বইটির মাধ্যমেও সংসারপথের ক্লান্ত পথিকেরা নবীন সঞ্জীবনী শক্তি লাভ করবেন, তাদের জীবনে নতুন আশা ও উদ্যম সঞ্চারিত হবে—এই বিশ্বাস আমরা রাখি।

— প্রকাশক

সূচীপত্র

॥ শ্রীহরিঃ ॥

আমাদের লক্ষ্য ও কর্তব্য

মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী বলা হয়ে থাকে ; সে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবে, আর ভেবে দেখলে মনে হয় যে ভগবান মানুষের রচনায় বৈশিষ্ট্যও রেখেছেন। কিন্তু মানুষকে প্রকৃতভাবে তখনই শ্রেষ্ঠ বলা যায় যখন সে জীবনের প্রধান লক্ষ্যে স্থির থেকে নিজ কর্তব্য পালন করে। কিন্তু যখন আমরা বর্তমান জগতের দিকে তাকিয়ে দেখি তখন দেখি যে, লক্ষ্য স্থির রেখে কর্তব্যে অবিচল থাকা তো দূরের কথা, লক্ষ্য ও কর্তব্য যে কী তাই সাধারণত লোকেরা জানে না, আর জানতে আগ্রহীও নয়।

বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত যে নিজ জ্ঞানে শাস্ত্রের কথা বুঝতে সক্ষম না হলে কোনো জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের কাছে, তেমন কাউকে না পেলে ধর্মের জ্ঞাতা ধর্মাচরণকারী ব্যক্তির কাছ থেকে আর তাও যদি না পাওয়া যায় তবে নিজ বুদ্ধিতে যাঁকে ধর্মজ্ঞানী মনে হয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করে নিজ কর্তব্য জেনে নেওয়া। তাও সম্ভব না হলে অন্ততপক্ষে নিজ অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। একজন ব্যক্তি বলেন 'সত্যই ধর্ম' অন্যজন বলেন 'ধর্ম-কর্ম বলে কিছু নেই' এমন অবস্থায় নিজ অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। বুদ্ধিকে বলা উচিত যে সে যেন নিরপেক্ষভাবে তার মতামত জানায়। এভাবে অন্তরাত্মা বা বুদ্ধি থেকে এই সাড়া পাওয়া যাবে যে— সত্য কথা বলাই সঠিক, কারণ সত্য সকলের পক্ষেই শুভ। এই ভাবেই ব্রহ্মচর্য, অহিংসাদি অন্যান্য প্রসঙ্গেও ভেবে দেখা উচিত এবং অন্তরাত্মা বা বুদ্ধির সিদ্ধান্ত জানার

পর সেই ভাবে কার্য সম্পাদনে তৎপর হয়ে যাওয়া উচিত। এভাবে নির্দেশ লাভ করেও যে যথাযথভাবে তা পালন করে না সে তো নিজের পতনের কারণ নিজেই হয়। ভালো কথা বুঝেও তা পালন না করা এবং মন্দ ভেবেও তা ত্যাগ না করা হলে তার তো অবশ্যই পতন হওয়া উচিত। শ্রীভগবান বলেন—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

(গীতা ৬।৫)

'নিজের দ্বারাই নিজেকে সংসার বন্ধন থেকে উদ্ধার করবে এবং নিজেকে কখনো অধোগতির পথে যেতে দেবে না ; কারণ মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু আবার নিজেই নিজের শত্রু।'

আমাদের যে রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ, শোক-ভয় প্রভৃতি অনুভূতি হয়, তা কেন হয় ? সকলে ভাবে যে প্রারব্ধবশত হয় কিন্তু তা ঠিক নয়। তা অজ্ঞানবশত হয়ে থাকে। শোক-ভয়ের জন্য রাগ-দ্বেষ হয় আর রাগ-দ্বেষই হল প্রধান ক্লেশ। অবিদ্যা অথবা অজ্ঞানই হল এর কারণ। অবিদ্যার নাশ হলে এই সবের আপনাআপনি বিনাশ হয়ে যায়।

ধনসম্পদ লাভ করা অথবা নষ্ট হওয়া, অসুস্থ অথবা সুস্থ হওয়া আর জন্ম-মৃত্যু আদি এই সকলের মূলে তো প্রারব্ধ (ভাগ্য) কিন্তু চিন্তা, ভয়, শোক, মোহ আদিতে অজ্ঞানই প্রধান কারণ। অজ্ঞান নাশ হলে শোক- মোহ থাকে না। শ্রুতি বলেন—

তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ। (ঈশ. ৭)
হর্ষশোকৌ জহাতি। (কঠ. ১।২।১২)

শোকাদিতে যদি প্রারব্ধ কারণ হত তাহলে ভগবান অর্জুনকে কেমন করে বলতেন—

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥

(গীতা ২।১১)

'হে অর্জুন ! যাদের জন্য শোক করা উচিত নয় এমন মানুষদের জন্য তুমি শোক করছ আবার পণ্ডিতের মতন কথাও বলছ ; কিন্তু পণ্ডিতগণ মৃত অথবা জীবিত কারো জন্যই শোক করেন না।'

জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের বিনাশ হয়। সাধনা করে আমাদের সেই জ্ঞান লাভ করা উচিত যাতে শোক-মোহ, চিন্তা-ভয়, চুরি-ব্যভিচার, মিথ্যা-কপট এবং আলস্য-অকর্মণ্যতা আদি দোষসকলের সতত নাশ হয়। জ্ঞান হলে, অজ্ঞানের এই সকল কার্য (পরিণাম) থাকে না। ধরা যাক—খুব ভালো রান্না হয়েছে, মিষ্টান্ন অতিশয় সুস্বাদু, আমরা মন দিয়ে খেতে বসেছি। দুই এক গ্রাস সবে মুখে তুলেছি, তখনই এক বন্ধু চুপিচুপি এসে খবর দিল—'মিষ্টান্নে বিষ আছে, খেও না।' তখন তা শুনেই মুখের গ্রাস তখনই ফেলে দিই, থালা সরিয়ে দিই। আর গিলে ফেলা গ্রাসকে বমি করে বার করে দেওয়ার চেষ্টা করি। বিষের কথা শোনা মাত্রই যতই মধুর ও সুস্বাদু বস্তু হোক না কেন আমরা তা আর খেতে পারি না। বন্ধুর কথায় বিশ্বাস হয় যে, সে যা বলেছে তা ঠিকই বলেছে। জগতের সুখ-ভোগ সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলা যায়। আমরা যদি শাস্ত্র, ভগবান অথবা সন্ত ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস করি তাহলে এই ভোগের প্রতি কখনো মন টানবে না। ভগবান স্বয়ং বলেন—

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥

(গীতা ৫।২২)

'ইন্দ্রিয় ও বিষয়াদির সংযোগে উৎপন্ন যে ভোগ—যদিও বিষয়ী ব্যক্তিদের কাছে তা সুখরূপে বিবেচিত হয় কিন্তু আসলে তা দুঃখেরই হেতু। এর আদি অন্ত আছে অর্থাৎ এ অনিত্য। সেইজন্য হে অর্জুন ! বুদ্ধিমান বিবেকশীল ব্যক্তি তাতে রমণ করেন না।'

এই কথা জেনেও যদি কেউ এতে মন দেয় তাহলে তো সে অতি মূর্খ। গোস্বামী তুলসীদাস বলেন—

নর তনু পাই বিষয়ঁ মন দেহীঁ। পলটি সুধা তে সঠ বিষ লেহীঁ॥

লোকেরা প্রশ্ন করতে পারে যে, বিষের প্রভাব তৎক্ষণাৎ দেখা যায় কিন্তু

এর তো তেমন প্রভাব চোখে পড়ে না। এর উত্তরে বলা যায়— বিষ বহু প্রকারের হয়ে থাকে। এমন বিষও হয়ে থাকে যার প্রভাব ধীরে ধীরে হয় কিন্তু তা অতি ভয়ংকর হয়। ঠিক তেমনই ভোগ হল ধীরে ধীরে প্রভাবিত করার এক ভয়ানক সুমিষ্ট বিষ। তাই রাজসিক বিষয় সুখকে ভগবান পরিণামে বিষতুল্য বলেছেন—

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥

(গীতা ১৮।৩৮)

'যে সুখ বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে হয়, যা ভোগকালের প্রারম্ভে অমৃতবৎ মনে হলেও পরিণামে তা বিষতুল্য—তাকে রাজসিক সুখ বলা হয়।'

যদি বলা হয় যে 'আমরা তো বহু বহু বিষ খেয়ে রেখেছি তাহলে এখন কী হবে ?' তার উপায় তো অনেক আছে। প্রথমে গ্রহণ করা বিষ বারও করা যেতে পারে, হজম করাও যেতে পারে। উত্তম বৈদ্য তার উপায় বলে দিতে পারেন কিন্তু প্রথমে বিশ্বাস আসা প্রয়োজন যে তা বস্তুত বিষ। বিশ্বাস হলে অন্ততপক্ষে ভবিষ্যতে তা খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। যদি তা এখনও সেই ভাবেই গ্রহণ করা হয় তাহলে কেমন করে ভাবা যায় যে আমরা ভগবানের কথার উপর বিশ্বাস করে সেটিকে দুঃখপ্রদ ও বিষবৎ মনে করেছি ?

শুনি, পড়ি কিন্তু বিশ্বাস হয় না। পূর্ণ বিশ্বাস হলে মানুষ ব্যবস্থা না করে কেমন করে থাকতে পারে ? বিশ্বাসই হল বিষনাশক সাধনে তৎপর হওয়ার একমাত্র আধার। প্রকৃত বিশ্বাস কেমন করে হয় ?

লগন লগন সব কোই কহৈ, লগন কহাবৈ সোয়।
নারায়ন জেহি লগনমেঁ, তন-মন ডারৈ খোয়॥
জো সির কাটে হরি মিলে, তো হরি লীজৈ দৌর।
না জানে যা দেরমেঁ গাঁহক আবৈ ঔর॥

কিন্তু এই বিষসেবন ত্যাগ করা প্রয়োজন এবং তা অবিলম্বে না করলে রক্ষা পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে। যে পর্যন্ত মৃত্যু দূরে আছে, দেহে প্রাণ আছে তার মধ্যেই অতি শীঘ্র উপায় করা প্রয়োজন। এ ভাবা ঠিক নয় যে তাড়া কী !

কিছু দিন পরে করে নেব। মৃত্যু কখন এসে উপস্থিত হবে তা কেউ বলতে পারে না। জীবনের কোনো স্থিরতা তো নেই ! এদিকে বিষ বেড়েই যাচ্ছে। যদি রাত্রে মৃত্যু হয় তাহলে কী করবেন ? অতএব এখনই জেগে উঠে পূর্ণ শক্তিতে লেগে পড়া প্রয়োজন।

আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত ঈশ্বর লাভ, কারণ ঈশ্বরই একমাত্র পরম সুখ ও শাশ্বত শান্তির কেন্দ্র। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং লাভ করবার সর্বাপেক্ষা যোগ্য পরম বস্তু, তাঁর প্রাপ্তিতেই জীবনের পূর্ণ ও যথার্থ সাফল্য নির্ভর করে এবং এই পরম লক্ষ্যকে লাভ করবার জন্য সতত যত্নশীল হওয়াই মানব জীবনের কর্তব্যপালন। এই কর্তব্যপালনে যতই ত্যাগ করা হোক না কেন, তাই অল্প। কেবল ত্যাগের প্রস্তুতি থাকা দরকার, ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হলে শাস্ত্র বলেন—ঈশ্বর লাভ হয় আর তা লাভ করাও সহজ ; আর এই বিশ্বাস ধারণ করা প্রয়োজন যে আমরা ঈশ্বর লাভের অধিকারী। তাই তো ভগবান মানবদেহ দিয়েছেন। অন্য যোনি তো অনেক আছে ; পশু, পক্ষী, ভাল্লুক, বানর ইত্যাদি বহু কিছুতেই তিনি আমাদের জন্ম দিতে পারতেন। তাহলে তিনি আমাদের মানবজন্ম কেন দিলেন ? এতেই প্রমাণ হয় যে আমরা তার অধিকারী। ভগবান আমাদের মুক্তির চাবিকাঠি দিয়েছেন। যা কিছু ন্যূনতা হয় তা আমাদের দিক দিয়ে। তিনি মানবদেহ দিয়ে আমাদের মুক্তির অধিকারী করে দিয়েছেন। এক্ষণে আমরা যদি প্রমাদ ও পাপ করি তাহলে তা তো আমাদের মূর্খতা। এমন মূর্খদের জন্য ভগবান বলেছেন—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥

(গীতা ১৬।১৯)

‘সেই দ্বেষপরায়ণ, পাপাচারী, ক্রূর, নরাধমদের আমি এই সংসারে বারংবার আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি।’

আসুরী যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥

(গীতা ১৬।২০)

'হে অর্জুন ! সেই মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে লাভ না করে জন্মে জন্মে আসুরী যোনি লাভ করে এবং ক্রমে তা থেকেও অত্যন্ত অধোগতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ঘোর নরকে পতিত হয়।'

পাপাচারী ও ক্রূরকর্মা নরাধমদের জন্য আসুরী যোনি এবং নরকের বিধান করা তো যথার্থ। কিন্তু ভগবান যে বলেছেন—**'আমাকে লাভ না করে'** এর রহস্য কী ? সরকার বলতেই পারেন যে চোর, পাজি ; তাকে বারংবার জেলে পাঠানো হবে, দ্বীপান্তরে পাঠানো হবে। কিন্তু তাকে **'রাজ্য না দিয়ে জেলে পাঠানো হবে'**—এর মানে কী ? কথাটা এই যে ভগবান যখন কোনো জীবকে মানবদেহ দিয়ে পাঠান তখন তো তাকে মুক্তির অধিকার দিয়েই পাঠিয়েছেন। সেই মুক্তির অধিকার লাভ করে আসা জীব যখন ভগবানকে ভুলে গিয়ে নিজ জন্মসিদ্ধ অধিকার উপেক্ষা করে পাপ করে এবং পুনঃ নরকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় তখন ভগবান আক্ষেপ করে বলেন যে —দেখো, আমি একে আমাকে লাভ করবার অধিকার দিয়ে পাঠিয়েছিলাম কিন্তু আজ একে নরকে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। এর চেয়ে বড় আক্ষেপ আর কী হতে পারে ?

যেমন কোনো রাজপুত্রের রাজ্যের উপর জন্মসিদ্ধ অধিকার থাকে কিন্তু যতক্ষণ সে নাবালক তাঁকে রাজ্যশাসনের যোগ্য মনে করা হয় না। রাজা স্বয়ংই রাজ্যের সমস্ত ব্যবস্থা করেন এবং রাজকুমার সাবালক হলে তাকে সমস্ত অধিকার অর্পণ করবার ইচ্ছা রাখেন। কিন্তু যদি সে অযোগ্য প্রমাণিত হয় এবং কুসঙ্গে পড়ে অনুচিত কর্ম করে, যার ফলে প্রজাদের ক্ষতি হয় তাহলে তেমন পরিস্থিতিতে জন্মসিদ্ধ স্বত্ব হলেও তাকে রাজ্যাধিকার থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয় তার জন্য দণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। দণ্ড দেওয়ার সময়ে রাজা আক্ষেপ করেন। এমন কথা মানুষের জন্যও প্রযোজ্য। মানুষের ঈশ্বরলাভ জন্মসিদ্ধ অধিকার তবুও নিজ অযোগ্যতা ও বিপরীতাচরণ হেতু তাকে নিজ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে দণ্ড ভোগও করতে হয়। এর থেকে অধিক তার দুর্ভাগ্য কী হবে ? তাই ভগবান উপরের শ্লোকে **'আমাকে লাভ না করে'** অধম গতি লাভ

করে—এমন কথা বলেছেন।

বস্তুত এটি অতিশয় দুঃখ ও লজ্জার কথা যে, এইভাবে আমরা দয়ালু ভগবানের দয়ার প্রতি সুবিচার না করে নিজ মানবজীবনকে ব্যর্থ করে তুলি। এটাই মানব জীবনের সব থেকে বড় বিফলতা এবং তা মানবের সব থেকে বড় ভুল। ভগবান বলেন—সত্বর চৈতন্যময় হও, কালের উপর ভরসা করে বিষয় ভোগে একটুও বিভ্রান্ত হয়ো না। ভেবো না যে মানবদেহ সতত থাকবে। এও ভেবো না যে আমাকে ভুলে তুমি এতে একটুও সুখের স্পর্শ পাবে। এই মানবদেহ আমি তোমাকে বিশেষ কৃপাপূর্বক প্রদান করেছি নিজের দিকে আকর্ষণ করে পরমানন্দরূপ পরমধামে নিয়ে যাওয়ায় জন্য। এই জন্ম অতিশয় দুর্লভ। কিন্তু তা অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর আর যে আমাকে ভুলে যায় তার জন্য নিতান্ত সুখরহিতও। তা লাভ করে কেবল প্রীতিপূর্বক আমারই ভজনা করো। তাহলেই তুমি জীবনের পরম লক্ষ্যরূপ আমাকে লাভ করে ধন্য হতে পারবে।

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।। (গীতা ৯।৩৩)

———o———

জগৎ-উদ্যান

কুরঙ্গমাতঙ্গ পতঙ্গভৃঙ্গমীনা হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ।
একঃ প্রমাদী স কথং ন হন্যতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ ॥

'মৃগ, হস্তী, পতঙ্গ, ভ্রমর ও মৎস্য—এই পঞ্চ-জীব পাঁচটি বিষয়ের এক একটির জন্য প্রাণ হারিয়ে থাকে ; তাহলে তো যে প্রমাদী একাই পঞ্চ-ইন্দ্রিয় সেবন করে সে কেমন করে বাঁচবে ?'

অতএব মনুষ্যমাত্রেরই উচিত যে, মন ও পঞ্চ-ইন্দ্রিয়কে বিষয় থেকে দূরে রেখে পরমাত্মায় নিত্যযুক্ত করা। এই প্রসঙ্গে একটা গল্প শুনুন। এক চক্রবর্তী সম্রাট ঘোষণা করেছিলেন— 'আগামীকাল যে ব্যক্তি আমাকে দর্শন করতে সক্ষম হবে তাকে আমি যুবরাজ পদ দেব। আমি যে উদ্যানবাটিকায় বাস করি তা কাল সারাদিন অবারিত দ্বার থাকবে। যে কেউ আমার কাছে আসতে পারে। কারো জন্য বাধানিষেধ নেই। প্রত্যেককে বাটিকায় ঘুরে বেড়াবার জন্য কেবল দুই ঘণ্টা সময় দেওয়া হবে, তার বেশি কাল কেউ ভিতরে থাকতে পারবে না। উদ্যানে প্রবেশ করে আমার কাছে আসবার জন্য কেবল আধ মিনিটই যথেষ্ট, কারণ বাটিকার পথসকল সুগম ও সুলভ। অতএব যে ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমার দর্শন করে নেবে তাকে যুবরাজ পদ দেওয়া হবে আর যে উদ্যানেই রমণ করতে থাকবে তাকে দুই ঘণ্টা পরে বের করে দেওয়া হবে।'

এই ঘোষণা রাজ্যের সর্বত্র প্রচারিত হল। আর সকাল হতেই লোকে উদ্যানে প্রবেশ করতে লাগল। বাটিকার দ্বারেই নিয়ামক-নিয়ন্ত্রণকর্তার নিবাসস্থান ছিল। সেই নিয়ন্ত্রণকর্তা উদ্যানে প্রবেশকারীকে একটি টিকিট দিচ্ছিলেন যার একটা প্রতিলিপি নিজের কাছে রেখে দিচ্ছিলেন। এইভাবে অনুমতিপত্র নিয়ে লোকে উদ্যানে প্রবেশ করতে লাগল। উদ্যানে ঢুকে কেউ নানারকম চামেলি, কেওড়া, গোলাপ পুষ্পের আঘ্রাণ উপভোগ করে বেড়াতে লাগল ; সুশীতল সুগন্ধযুক্ত বায়ু তাদের মুগ্ধ করেছিল। আবার

আরও কিছু লোক এগিয়ে গিয়ে মেওয়া ও সুমধুর ফল পেড়ে খেতে লাগল। আরও কিছু লোক আরও এগিয়ে গিয়ে সার্কাস, সিনেমা, মিউজিয়াম, নাট্যাভিনয় আর রত্নের স্তূপ আর সুবর্ণ রজতের মুদ্রা আর বহু ধরনের পূর্বে না জানা, না দেখা জিনিস প্রত্যক্ষ করতে লাগল। কিছু লোক রমণীদের সঙ্গে রমণ করতে লাগল, যারা পুষ্পশয্যায় শায়িতা ছিল। আরও কিছু লোক এগিয়ে গিয়ে যন্ত্রসংগীত, কণ্ঠ সংগীত শুনতে লাগল। এইভাবে লোকেরা উদ্যানের সুখ, আরাম ও ভোগে যুক্ত থেকে রাজদর্শনে নিরাশ হল এবং অজ্ঞানতার বশীভূত হয়ে ভাবতে লাগল যে রাজার দর্শন করে কী হবে ! তাদের মধ্যে একজন বৈরাগ্যযুক্ত পুরুষ ছিলেন যাঁর মন ও ইন্দ্রিয় বশীভূত ছিল। তিনি সুখ, আরাম, স্বাদ, ভোগ আদিকে দূরে ঠেলে সোজা মহারাজের কাছে গিয়ে উপনীত হলেন। মহারাজ তাঁকে যুবরাজ পদ প্রদান করলেন।

ব্যবস্থাপকের অনেক চর সেই উদ্যানে ঘুরছিল যারা নির্ধারিত সময় শেষ হওয়া মাত্রই টিকিট ছিনিয়ে নিয়ে তাদের উদ্যানের বাইরে বার করে দিচ্ছিল। কিন্তু যারা পুষ্প সুগন্ধ নিয়ে হাওয়া খাচ্ছিল তারা বলল—'আমাদের আরও কিছুক্ষণ থাকতে দাও।' কিন্তু দারোয়ানগণ কড়া ছিল, কেউ এক মিনিটও বেশি থাকতে পারছিল না—তারা তাদের ধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছিল। যে লোকেরা মেওয়া ও মধুর ফল খাচ্ছিল তারা দারোয়ানকে বলল— 'ভাই ! আমাদের দুই মিনিট আরও থাকতে দাও। আমরা মেওয়া ও ফল একত্র করেছি—বোঁচকাটা বেঁধে ফেলি।' দারোয়ান জানাল—'এখান থেকে কেউ কোনো জিনিস সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না। যা খেয়েছো তাতেই সন্তুষ্ট থাকো।' এই বলে দারোয়ান বোঁচকা কেড়ে নিয়ে ধাক্কা মেরে তাদের বাইরে বের করে দিল। যারা বিনোদন ও অভিনয় প্রভৃতি দেখছিল তারা তো উঠতে চাইছিল না কিন্তু সেইখানে কেউ এক মিনিটও বেশি থাকতে পারে কি ? দারোয়ান তাদের জোর করে বাইরে বের করে দিল। কতলোক টাকা, মোহর ও রত্নের পুঁটলি করে নিল। দারোয়ান জিজ্ঞাসা করল—'এইটা কি ? তুমি পুঁটলি কেন বেঁধেছ ?' তারা বলল—'এই টাকা,

মোহর ও রত্ন আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব।' দারোয়ান তাদের লাঠিপেটা করতে করতে বলল—'মূর্খগণ ! এইগুলি তোমরা কেবল দর্শনই করতে পার। এইখান থেকে কেউ এক আধলাও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না।' তাদের বাঁধা পুঁটলি ছেড়ে যেতে বড় দুঃখ হচ্ছিল ; কিন্তু উপায় ছিল না, বাধ্য হয়ে ছেড়ে যেতেই হবে। যারা পুষ্পশয্যায় শয়ন করে রমণীসঙ্গ উপভোগ করছিল তারা কিছুতেই বাইরে যেতে চাইছিল না কিন্তু আইনত দারোয়ান এক মুহূর্তও সেইখানে থাকতে দিল না। সময় শেষ হতেই দারোয়ান লাঠি মেরে তাদের বাইরে বের করে দিল আর যারা সংগীত আদি শুনছিল তারা তো জানতই না যে কত কাল অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। দারোয়ান তাদের টিকিটের নম্বর দেখে বলল—'চলো তোমাদের যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে।' যারা শুনছিল তারা বলল— 'আরে ভাই ! এই গানটা তো পুরো শুনতে দাও।' দারোয়ান বলল—'তোমাদের সময় শেষ হয়ে গিয়েছে, তোমরা আর এক মুহূর্তও এইখানে থাকতে পারবে না।' তারাও লাঠিপেটা খেয়ে উদ্যান থেকে বেরিয়ে এল।

এটি একটি কল্পিত উদাহরণ। এক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে যে, চক্রবর্তী সম্রাট হলেন ভগবান আর তাঁর উদ্যান হল এই জগৎ। রাজার ঘোষণাই শ্রুতি-স্মৃতি আদি ধর্মগ্রন্থ। লোকেদের আসা-যাওয়াই সময়-কাল। উদ্যানের জন্য নির্ধারিত দুই ঘণ্টা সময় হল মানুষের আয়ু। রাজার দর্শন সকলের জন্যই প্রশস্ত তাই মানুষ মাত্রের জন্য ঈশ্বর প্রাপ্তির স্বতন্ত্রতার ঘোষণা। যুবরাজ পদই হল পরম নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তি। সহজ ও সুলভ পথে গিয়ে আধ মিনিটে পথ অতিক্রম করাই হল ভক্তি আদি উচ্চকোটি সহজ সাধনার দ্বারা ছয় মাসে ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের পথ। নিয়ামক ধর্মরাজ। টিকিট দেওয়া আয়ু। টিকিটের প্রতিলিপি রাখাই আয়ুর হিসাব। উদ্যানে প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণই হল মানুষের জন্ম-মৃত্যু। উদ্যানে প্রবেশ করে পুষ্পগন্ধযুক্ত বায়ু সেবনই এইখানে নাসিকা ইন্দ্রিয়র বশীভূত হয়ে মানুষের পুষ্পমালা, আতর আদি সুগন্ধে সময় নষ্ট করা। উদ্যানে মেওয়া ও মধুর ফল ভক্ষণই জিহ্বা ইন্দ্রিয় বশীভূত মানুষের ভোজনাদিতে রসাস্বাদে সময় নষ্ট করা। উদ্যানে বিনোদন আদি

দেখা হল নেত্র ইন্দ্রিয়র বশীভূত মানুষের অবক্ষয়যুক্ত ক্ষণভঙ্গুর আশ্চর্যজনক পদার্থসকল দেখে নিজ অমূল্য সময় নষ্ট করা। উদ্যানে পুষ্পশয্যায় রমণীসঙ্গ করা আদিই এইখানে স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের বশীভূত মানুষের স্পর্শাদি দ্বারা স্পর্শের যোগ্য বিনাশশীল ক্ষণভঙ্গুর পদার্থসকল উপভোগ করে নিজের জীবনকে বিপদের মুখে নিয়ে যাওয়া। উদ্যানে সংগীত আদি শ্রবণ করা হল—কর্ণেন্দ্রিয় বশীভূত মানুষের রসের কথা শ্রবণ করে নিজ অমূল্য জীবনকে বৃথা নষ্ট করা। রাজার দর্শনে নিরাশ হওয়া হল ঈশ্বরলাভে শ্রদ্ধার ঘাটতির কারণে সাধনায় অকর্মণ্যতা। উদ্যানে সোজা রাজদর্শনে গমনকারী যে মন-ইন্দ্রিয় সংযমী বৈরাগ্যবান পুরুষ, সেই এইখানে পরম সাক্ষাৎকার-রূপ সিদ্ধি-লাভকারী উচ্চকোটির সাধক। উদ্যানে রাজদর্শনই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার এবং যুবরাজ পদই পরমপদ প্রাপ্তি। উদ্যানে পরিভ্রমণকারী দারোয়ানই এই জগতে ধর্মরাজের দূত। টিকিটের আয়ু শেষ হওয়াই এইখানে মানুষের আয়ুর পরিসমাপ্তি। উদ্যানের বাইরে বের করে দেওয়াই মানুষকে যমরাজের হাতে তুলে দেওয়া। উদ্যানে ফল ও সম্পদের পুঁটলি বাঁধা হল মৃত্যুকালে অজ্ঞান ও স্নেহবশত সম্পদাদিতে আসক্ত থাকা। আয়ুর পরিসমাপ্তির ইচ্ছা না থাকলেও দারোয়ানের লাঠিপেটা ও ধাক্কা মেরে বাইরে বের করে দেওয়াই এইখানে মৃত্যুর ইচ্ছা না থাকলেও যমদূত দ্বারা জোর করে যন্ত্রণা দিয়ে যমদ্বারে নিয়ে যাওয়া। উদ্যানের মেওয়া, ফল, সম্পদ আদি কোনো বস্তু সঙ্গে না নিয়ে যেতে পারাই এই জগতে মেওয়া মিষ্টান্ন, সম্পদ, স্ত্রী-পুত্র আদি সকল এইখানেই ত্যাগ করে যাওয়া, কারণ এই জগতে কিঞ্চিতমাত্রও বস্তু আজ পর্যন্ত কেউ সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেনি, যাবেও না। তাই এই বিনাশশীল ক্ষণভঙ্গুর পদার্থে ও বিষয়ে বৈরাগ্য ধারণ করে মন-ইন্দ্রিয়কে তা থেকে সরিয়ে পরমাত্মায় নিত্যযুক্ত করা উচিত।

———o———

সময়ের সার্থক ব্যবহার

শ্রীভর্তৃহরি বলেন—

আদিত্যস্য গতাগতৈরহরহঃ সংক্ষীয়তে জীবিতং
ব্যাপারৈর্বহুকার্যভারগুরুভিঃ কালো ন বিজ্ঞায়তে।
দৃষ্ট্বা জন্মজরাবিপত্তিমরণং ত্রাসশ্চ নোৎপদ্যতে
পীত্বা মোহময়ীং প্রমাদমদিরামুন্মত্তভূতং জগৎ॥

'সূর্যের উদয় ও অস্ত গমনাগমন দ্বারা প্রতিদিন আয়ুক্ষয় হয়ে থাকে কিন্তু ব্যবসা-ব্যবহার সম্বন্ধিত অনেক গুরুভারের জন্য মানুষ টের পায় না যে কতটা সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে এবং জন্ম, বৃদ্ধাবস্থা, বিপত্তি ও মৃত্যু দেখেও তার ভয় উৎপন্ন হয় না। এইভাবে সমগ্র জগৎ প্রমাদরূপ মোহময় সুরা পান করে উন্মত্ত হয় অর্থাৎ সে নিজ কর্তব্যাকর্তব্যর বিবেক বিরহিত হয়ে প্রমত্তসম অজ্ঞান নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকে।'

এই অবস্থায় প্রমাদে মত্ত না হয়ে সাবধানে আমাদের বিচার করা উচিত যে আমাদের জীবনের কতটা সময় চলে গেল—আয়ু কতটা কমে গেল। ভেবে দেখলে জানা যাবে যে আমাদের অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে, সময় কেটে যাচ্ছে, জীবনের অল্পই অবশেষ রয়েছে। অতএব জীবনের যা মুখ্য উদ্দেশ্য, যা প্রথম কর্তব্য তার দিকে দৃষ্টি রেখে ত্বরিৎ গতিতে সেই পথে লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে।

বঙ্গদেশের এক শোনা ঘটনা—কতদূর সত্য, জানা নেই। এক ধনী ব্যবসায়ীর গৃহে এক দুগ্ধ বিক্রেতা গয়লানি এল আর সে দুধ দিয়ে তার দুধের দাম চাইল। হিসাবরক্ষক তাকে বললেন—'প্রথমে বাজারে ঘুরে আয়, ঘরে যাওয়ার সময়ে পয়সা নিয়ে যাস।' সেই গয়লানি তখন চলে গেল ও বাজারের কাজ সেরে আবার ব্যবসায়ীর গৃহে এল আর হিসাবরক্ষকের কাছে পয়সা চাইল। তিনি ব্যস্ত ছিলেন। দাঁড়াতে বললেন। সেই গয়লানি দুই তিন বার পয়সা চাইল কিন্তু হিসাবরক্ষক পয়সা দিলেন না। তখন সেই গয়লানি দুঃখিত হয়ে বলল—'আর বেলা নাই। আমাকে বহুদূর যেতে হবে সূর্য পাটে

বসেছেন।' ধনী ব্যবসায়ী কাছেই বসে কাজ করছিলেন। সেই গয়লানির করুণ কথাগুলি তাঁর প্রাণে বাজল। তিনি হিসাবরক্ষককে বলে তার পয়সা দিয়ে দিলেন। ধনী ব্যবসায়ীর সেই কথা মনে ধরল। তিনি তখনই হিসাবরক্ষককে বললেন—'আমার দেনা-পাওনা বের করো ও ব্যবসা গুটিয়ে দাও।' হিসাবরক্ষক তাঁর কথা শুনে আশ্চর্য হলেন আর বললেন—'আপনি এমন কথা কেন বলছেন ?' ব্যবসায়ী বললেন—'তুমি শুনলে না, গয়লানি কী বলল ? সে বলল—'**আর বেলা নাই**'। কথাটা খুব সত্য। জীবন সায়াহ্নে এসে পৌঁছেছি ভাই ! আমার আর সময় তো নেই।' এই বলে কাজকর্ম সব বুঝিয়ে দিয়ে ব্যবসায়ী গৃহ ত্যাগ করলেন আর নিজ শেষ জীবন অহর্নিশ হরিনাম করে কাটালেন।

আমাদের এই ঘটনাকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করা উচিত। আমাদের আয়ু প্রতিক্ষণে ক্ষীণ হচ্ছে। যার বয়স চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর তার তো জীবনের বেশির ভাগ আয়ু কেটেই গেছে কিছু অল্পই বাকি আছে। যার কম বয়স তারও নিশ্চিন্ত থাকবার উপায় আছে কী ? মানবজীবনের পূর্ণায়ু শত বৎসর বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এই যুগে পূর্ণায়ু পার হওয়া কঠিন। আজকাল তো আশি বৎসরকেই পূর্ণায়ু ধরা উচিত এবং এই পরিমিত আয়ুর বিচারে আমাদের অল্প সময়ই বাকি আছে। তাই চৈতন্যলাভ করে অতি শীঘ্র আমাদের আসল লক্ষ্যে পৌঁছানো উচিত। আমরা সতর্ক হয়ে অবশিষ্ট দিন এমনভাবে কাটাই যাতে জীবন উন্নত হয়।

তাই একটা দামি কথা জেনে রাখা ভালো যা সকল শ্রেণীর ব্যক্তি করতে পারে এবং তা সহজ-সরলও। এতে বেশি বুদ্ধির দরকার হয় না, বেশি পরিশ্রমেরও দরকার নেই। নির্গুণ নিরাকার উপাসনা বোঝবার জন্য তীব্র বুদ্ধির প্রয়োজন হয়, এতে তার প্রয়োজন নেই। আর তা সহজ-সরল হওয়া সত্ত্বেও সর্বোত্তম ফলপ্রদায়ক। তা হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি অনন্য ভক্তি। তা যেন অন্ধকে লাঠি ধরে নিয়ে গিয়ে পার করে দেওয়ার মতন সহজ-সরল ও নিশ্চিত পথ। ভগবদ্ভক্তির এই পথ এতই সহজ, নিষ্কণ্টক ও অন্ধকাররহিত যে তাতে কোথাও হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়ার ভয় নেই। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৩৪-৩৫) বলা হয়েছে—

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।
অজ্ঞঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥
যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥

'রাজন্! অজ্ঞ ব্যক্তিদের সত্বর নিশ্চিতভাবে পরমাত্মা লাভের যে উপায় ভগবান বলেছেন তাকেই তুমি ভগবৎ নিমিত্ত ধর্ম বলে জানবে, যার আশ্রয়ে মানুষ কখনো বিপরীতগামী হয় না। সে যদি সেই পথে চোখ বন্ধ করেও ছুটে চলে তাও সে পিছলে যায় না, পড়েও যায় না।'

যে ভাবে ভক্তকবি সুরদাসকে পথপ্রদর্শনের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এসে গিয়েছিলেন সেইভাবেই তিনি ভক্তিপথের ব্যক্তিদের সঠিক পথ বলে দেওয়ার জন্য স্বয়ং উপস্থিত হন। যখন ভক্ত সুরদাস বেলকাঁটা চোখে ফুটিয়ে ভগবানের দর্শনের লালসায় অরণ্যে ঘুরছিলেন তখন ভগবান বালকরূপে এসে তাঁকে নিজের হাতে মিষ্টান্ন দিয়েছিলেন। সেই দুর্লভ প্রসাদ লাভ করে সুরদাসের চিত্ত আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে পড়ে। তিনি জিজ্ঞাসা করায় বালক সাধারণ পরিচয় দিয়ে চলে গেল। এক দিন সেই বালক আবার এল, কথা প্রসঙ্গে বৃন্দাবনের কথা উঠল। সে সুরদাসের লাঠি ধরে তাঁকে পথ দেখানোর জন্য আগে আগে চলল। সুরদাস তার হাত ধরলেন, ভগবানের হাতের স্পর্শ লাভ করে দেহে যেন প্রেমানন্দের বিদ্যুৎ প্রবাহিত হল। তিনি বুঝতে পারলেন যে বালক সাক্ষাৎ ভগবান। তিনি ভগবানের হাত আরও জোরে চেপে ধরলেন কিন্তু ভগবান তা জোর করে ছাড়িয়ে নিলেন। তখন ভক্তকবি সুরদাস বললেন—

হাথ ছুড়ায়ে জাত হৌ নিবল জানি কৈ মোহি।
হিরদৈ তেঁ জব জাহুগে মরদ বদৌঁগো তোহি॥

'প্রাণপ্রিয় ! তুমি আমাকে দুর্বল জেনে হাত ছাড়িয়ে নিচ্ছ তাতে আর তোমার বাহাদুরি কী আছে ? তোমার পরাক্রম তো আমি তখন স্বীকার করব যখন তুমি আমার অন্তর থেকে চলে যাবে।'

নিজের উপর কতটা বিশ্বাস ! প্রেমের সুদৃঢ় রজ্জুতে যে ঈশ্বরকে নিজ হৃদয়ে বেঁধে রেখেছে তার অন্তর থেকে ভগবান কেমন করে যাবেন। তাঁর

ভক্তি ও প্রেম দেখে ভগবান তার সম্মুখেই আবির্ভূত হলেন আর সাক্ষাৎ দর্শন দান করে তাঁকে কৃতার্থ করলেন।

ভগবানের আশ্রয় নিয়ে যে সাধনা করে তার জন্য কত সহজ-সরল নিশ্চিত উপায়। ভবগান স্বয়ং গীতায় বলেন—

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি নচিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥

(গীতা ১২।৭)

'হে অর্জুন! সেই সকল মদ্‌গতচিত্ত ভক্তকে আমি অতি শীঘ্রই মৃত্যুরূপ সংসার সাগর হতে উদ্ধার করি।'

শুধু তাই নয়, সেই অনন্য ভক্তের যোগক্ষেমের দায়িত্বও ভগবান নিজের উপর নিয়ে নেন। তিনি বলেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

(গীতা ৯।২২)

'অনন্যচিত্তে যে ভক্তগণ আমাকে সর্বদা নিষ্কামভাবে ভজনা করেন সেই নিত্য সমাহিত মুমুক্ষুগণের যোগক্ষেম আমি স্বয়ং বহন করি।'

এখন প্রশ্ন ওঠে যে এই অনন্যচিত্তে চিন্তা করবার উপায় কী ? তার জন্য অতি সহজ ও সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হল—সর্বত্র ভগবদ্বুদ্ধি করা।

ভগবান বলেছেন—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥

(গীতা ৭।১৯)

'বহু জন্মের শেষে এই জন্মে তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ 'সবকিছুই বাসুদেব' —এইরূপ জেনে আমার ভজনা করেন ; এইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।'

শ্রীরামচরিতমানসে শ্রীরঘুনাথ শ্রীহনুমানকে বলেছেন—

সো অনন্য জাকেঁ অসি মতি ন টরই হনুমন্ত।
মৈঁ সেবক সচরাচর রূপ স্বামি ভগবন্ত॥

'যার বুদ্ধি কখনো বিচ্যুত হয় না—সতত, এভাবে অটল থাকে যে, এই

বিশ্বচরাচর জগৎ বলে দৃশ্য সব কিছুই সর্বলোক মহেশ্বর ভগবান শ্রীহরি আর আমি তাঁর দাস—সেই অনন্য ভক্ত।'

শ্রীভগবানের কথার উপর বিশ্বাস করে এটি বিশেষভাবে বোঝবার চেষ্টা করা উচিত। যেমন সবুজ রঙের চশমা পরলে মানুষ সব কিছু তেমনই দেখে—সবুজই দেখে, সেই ভাবে যে হৃদয় নেত্রে হরিরূপ চশমা লাগিয়ে নেয় সে সর্বত্র হরিকেই দেখতে থাকে। তাই নিজ অন্তরের ভাবকে হরিময় করে নিতে হয়। এমন হলে বাইরে থেকে অন্য বস্তু দেখা গেলেও অন্তরে হরিই দেখা যেতে থাকবে। যেমন মৃত্তিকা নির্মিত বস্তু—ঘড়া, সরা, প্রদীপ সব তত্ত্বত এক মৃত্তিকা, তদনুরূপ লৌহ নির্মিত ছুরি, কাঁচি, তরবারি সকল বস্তুই লৌহ। সেইভাবে সম্পূর্ণ জগৎ—সমস্ত জাগতিক বস্তু তত্ত্বত একমাত্র হরি। এই হল বাস্তবিক সিদ্ধান্ত। তা বুঝে সচেষ্ট হলে সত্বর এমন ভাব হওয়া অসম্ভব নয়।

অনিচ্ছা বা অপরের ইচ্ছায় কৃতকর্মকে ভগবানের লীলা মনে করুন কারণ সর্ববস্তুতে তো ভগবান অবস্থান করেন। তাই তার দ্বারা কর্ম সবই ভগবানের লীলা। এই ভাব আসতে পারলে পরম শান্তি সুনিশ্চিত হয়, কেবল তা আনয়নের প্রয়োজন। আপনি যে কোনো কর্মে যুক্ত হতে পারেন তাতে বলবার কিছু নেই কিন্তু অন্তরে ওই ভাব রাখা প্রয়োজন। এতে আপনার কিছুই খরচ করতে হয় না ; করতেও কোনো পরিশ্রম নেই বরং তা সহজ-সরল এবং আপনার মধ্যে যদি কোনো রকম দোষও বিদ্যমান থাকে তাহলে এই ভাবের মধ্যে এত শক্তি আছে যে তাও ভস্ম করে ফেলবে। কেবল আপনার বুদ্ধিতে এই পবিত্রতম ভাব সতত জাগ্রত থাকতে হবে যে, **'সব কিছু তত্ত্বত এক হরি, তাঁর দ্বারা যে কর্মসৃষ্টি সবই তাঁর লীলা।'**

যেভাবে স্বর্ণকার সুবর্ণ সহযোগে নানারকম অলংকার প্রস্তুত করে কিন্তু অলংকার প্রস্তুত করবার সময়ে তার বুদ্ধিতে স্থির নিশ্চয় থাকে যে তা সুবর্ণ আর সুবর্ণ গলিয়ে ফেলবার সময়েও তা সুবর্ণ, এই স্থির ধারণা থাকে। তেমনই আমাদেরও 'সবই এক ভগবান'—এ ভাবে সতত অধিষ্ঠান করা উচিত। এখন যে আমাদের বুদ্ধিতে জগতের নানাভাব ভরে আছে তা না হয়ে এক ভগবদ্ভাব হওয়া দরকার।

আগে বলা হয়েছে যে 'স্বল্প সময় অবশিষ্ট আছে' এই কথায় চিন্তিত হওয়ার দরকার নেই। যেটুকু সময় অবশিষ্ট আছে তাতেই আমাদের উদ্ধার হওয়া সম্ভব। আপনি হয়তো জিজ্ঞাসা করবেন যে যার আয়ুতে দুই-এক দিনই অবশিষ্ট তার কী উদ্ধার হওয়া সম্ভব ? দু-এক দিন তো অনেকটা সময় ; যার দুই এক ঘণ্টা হাতে আছে তারও উদ্ধার হতে পারে। ভাগবতকার বলেন—

কিং প্রমত্তস্য বহুভিঃ পরোক্ষৈর্হায়নৈরিহ।
বরং মুহূর্তং বিদিতং ঘটেত শ্রেয়সে যতঃ॥
খট্বাঙ্গো নাম রাজর্ষির্জ্ঞাত্বেয়ত্তামিহায়ুষঃ।
মুহূর্তাৎ সর্বমুৎসৃজ্য গতবানভয়ং হরিম্॥

(২।১।১২-১৩)

'প্রমত্ত অর্থাৎ ঈশ্বর-বিমুখ এবং বিষয়াসক্ত থেকে জগতে বহুকাল বেঁচে থাকায় কী লাভ ? আমাদের তো যাতে কল্যাণ হয় এমন (ভগবদ্ভক্তিযুক্ত) মুহূর্তের জীবনই ভালো মনে হয়। খট্বাঙ্গ নামের রাজর্ষির যখন নিজ জীবনের অন্ত বিদিত হল তখন তিনি এক মুহূর্তে এইখানেই সর্বস্ব ছেড়ে অভয়দানকারী শ্রীহরিকে লাভ করলেন।'

জনৈক কবি জানিয়েছেন—

জীবন থোড়া হী ভলা, জো হরি-সুমিরন হোয়।
লাখ বরসকা জীবনা লেখে ধরৈ ন কোয়॥

কেবল এর একটাই শর্ত আছে—শ্রীভগবানকে কখনো ত্যাগ করবে না। তাঁকে সতত স্মরণ-মনন রাখবে। ভগবান গীতাতে বলেছেন—'**মচ্চিত্তঃ সততং ভব**' (১৮।৫৭)—চিত্ত সতত আমাতে সমাহিত রাখবে।

যে সতত ঈশ্বরকে স্মরণ-মনন করে তাকে ঈশ্বর কেমন করে ছাড়তে পারেন ? সতত ভগবৎ-চিন্তায় নিমগ্ন ব্যক্তির অন্তকালে ভগবানের স্মৃতি থাকবেই আর অন্তকালে তাঁকে মনে থাকলে উদ্ধার হবেই এতে কোনো সন্দেহ নেই। স্বয়ং ভগবান বলেন—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥

(গীতা ৮।৫)

'যিনি মৃত্যুকালে আমাকেই স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন তিনি আমাকেই লাভ করেন—এতে কোনো সংশয় নেই।'

আপনি বলবেন যে সতত স্মরণ হয় না। তার কারণ এই যে, শ্রদ্ধার অভাবে সতত স্মরণের রহস্য ও প্রভাব আপনি জানেন না। নদীতে যে ডুবে যাচ্ছে সে যদি নৌকায় দড়ি ধরতে পারে তাহলে কেউ বললে সে তা কখনো ছাড়তে পারে ? কখনো নয়। তেমনই যদি ভগবানে আপনার বিশ্বাস থাকে তাহলে আপনি ভগবানকে ছাড়তে পারেন কী ? এই জগৎ সাগরসম। তাতে ভগবানের চরণই সুদৃঢ় নৌকা। যে ব্যক্তি ভগবানের পাদপদ্ম ভক্তিভাবে ধারণ করে সে অনায়াসেই পার হতে পারে। সেই সর্বশক্তিমান ভগবানের চরণযুগলকে মনে ধরে রাখো এবং সতত তার স্মরণ-মনন করো। তাই শরণাগতি। তার নামই ভক্তি।

যদি বলেন যে সতত তাঁকে স্মরণে রাখা কঠিন তাহলে বলা হবে যে, তা ঠিক নয়। আপনি একে কঠিন মনে করে রেখেছেন তাই তা কঠিন মনে হয়। আপনি এর প্রকৃত তত্ত্ব ও রহস্য এখনও বুঝতে পারেননি ; যদি বুঝতেন তাহলে তা কখনই ছাড়তে পারতেন না। যদি আপনি বুঝতেন যে যেই ভগবৎ-চিন্তা বন্ধ হবে তখনই আপনি সমুদ্রে তলিয়ে যাবেন তাহলে আপনার আর ভুল হত না। নিমজ্জমান ব্যক্তি এই তত্ত্বকে জানে যে নৌকাতেই তার রক্ষা সম্ভব। তাই একবার তা ধরে ফেললে সে তারপর তা ছাড়ে না।

যদি বলেন যে আমরা তো পাপী, আমাদের উদ্ধার এত তাড়াতাড়ি কেমন করে সম্ভব, তাহলে বলব ভয় পাবেন না। ভগবান স্বয়ং বলেন—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

(গীতা ৯।৩০-৩১)

'অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্য ভক্তির দ্বারা আমার ভজনা করে তবে তাকে সাধু বলে জানবে কারণ তার সংকল্প অতি শুভ। সেই ব্যক্তি

শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে যায় এবং শাশ্বত শান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয় ! তুমি নিশ্চিত জেনো যে আমার ভক্ত কখনো বিনষ্ট হয় না।'

যে প্রাণপণে সাধনায় যুক্ত হয়, সে কখনো হতোদ্যম হয় না। অকর্মণ্য হয় না—গড়িমসি করে না, তার জন্য কোথাও কোনো বাধা আসে না। যার একমাত্র ভগবানেই বিশ্বাস, যার বুদ্ধিতে এই ভাব গেঁথে গিয়েছে যে ভগবান দ্বারাই আমার উদ্ধার হবে এবং দৃঢ় বিশ্বাসে ভগবানেরই শরণাগত হয়েছে, তার কাছে যত কম সময়ই থাক, সে যেমন পাপীই হোক, ভক্তির এমন শক্তি যে তার উদ্ধার হয়ে যায়।

যদি বলেন যে যার জ্ঞান নেই আর যে মূর্খ তারও উদ্ধার হওয়া সম্ভব ? তাহলে বলব অবশ্যই হতে পারে। শ্রীভগবান বলেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপয়ান্তি তে॥

(গীতা ১০।১০)

'সর্বদা আমার ধ্যানে আসক্ত এবং প্রেমপূর্বক ভজনশীল সেই ভক্তদের আমি তত্ত্বজ্ঞানরূপ যোগ প্রদান করি যাতে তাঁরা আমাকেই লাভ করেন।'

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥

(গীতা ১৩।২৫)

'আবার কেউ কেউ যারা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁরা এইভাবে আত্মাকে না জানতে পেরে অন্যের কাছে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের কাছে শুনে তদনুসারে উপাসনা করেন এবং এইরূপ শ্রবণপরায়ণ ব্যক্তিও মৃত্যুরূপ সংসার সাগর নিঃসংশয়ে অতিক্রম করেন।'

আসল কথা হল কেউ যেমনই অজ্ঞানী অথবা মূর্খ হোক না কেন, যদি সে ঈশ্বরের অনন্যভক্তি করতে শুরু করে বা জ্ঞানী মহাত্মার কাছে গমন করে কিছু শ্রবণ করে আর তদনুসারে আচরণ শুরু করে তাহলে সেও পরমপদ পেতে পারে। মূর্খ হলেও চিন্তা নেই তাকে মহাত্মা বা স্বয়ং ভগবানই জ্ঞান দান করতে পারেন। পাপী, মূর্খ হলেও আয়ুর অল্পকাল অবশিষ্ট থাকলেও ভগবানের কৃপায় মুক্তি হতে পারে। কেবল একটি কাজ করতে

হবে। 'ভগবান আছেন' — এই সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ওঠা বসা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ, চলা-ফেরা, শোওয়া-জাগা করতে হবে—সতত ভগবানকে স্মরণে রাখতে হবে। আপনি বলবেন যে নিদ্রাগমন কালে তো স্মরণ হয় না। তাহলে বলব যদি দিনে আমার স্মরণ-মনন চলে তাহলে রাত্রেও তা অব্যাহত থাকবে কারণ যে কার্য দিনে করা হয় তা রাত্রেও স্বপ্নে আসতে থাকে। রাত্রিকালে স্মরণ যাতে হয় তার একটা সহজ উপায় আছে। শয়নকালে শুয়েও তা করা যেতে পারে। দশ-পনেরো মিনিট জাগতিক সংকল্প প্রবাহ থেকে দূরে গিয়ে ভগবানের নাম রূপ স্মরণ করে ও তাঁর লীলাসকল মনন করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ুন। তাতে রাত্রে ভগবানের স্মরণ হতে থাকবে। আসল কথা যে, সতত ভগবানকে মনে রাখুন, কখনো তাঁকে ভুলবেন না। যদি ত্রিভুবনের রাজ্যলাভও হয় সেটিও অতি নগণ্য মনে করে ত্যাগ করবেন কিন্তু ভগবানের স্মরণ-মনন ছাড়বেন না। যদি কখনো ভগবানের বিস্মরণ না হয় আর যার একমাত্র ভগবানই পরমপ্রিয় ও সর্বস্ব, সেই ধন্য। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা আছে—

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষার্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥
বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥

(১১।২।৫৩, ৫৫)

'ত্রিভুবনের রাজ্যবৈভবের জন্য যার ভগবৎচিন্তা বিঘ্নিত হয় না, যে ভগবানেই মন সন্নিবিষ্টকারী, দেবতাদি দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ভগবৎ চরণকমলের স্মরণে মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুত হয় না, সেই ভগবদ্ভক্তদের মধ্যে অগ্রগণ্য হয়। বিবশ হয়ে নাম উচ্চারণকারীরও যিনি সম্পূর্ণ পাপ ধ্বংস করেন, সেই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর ভক্তকে কখনো ত্যাগ করতে পারেন না কারণ তাঁর পাদপদ্ম ভক্তের প্রেম রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ থাকে। তাকেই ভগবদ্ভক্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হয়।'

ঈশ্বর আমাদের বিবেক, বুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়েছেন কেননা তিনি চান যে আমরা তার সদ্ব্যবহার করি। বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেইই, যে নিজের সময়কে

সর্বোত্তম কার্যে নিযুক্ত রাখে, এক মুহূর্তও সময় ব্যর্থ কাজে নষ্ট করে না। সে যে কার্যের জন্য এসেছে সর্বপ্রথমে সেই কার্যই সম্পূর্ণ করে। কখনো ক্ষতিকর কোনো কার্য করে না, সতত মুক্তি লাভের কার্য করে আর যা সব চেয়ে বেশি দামি হয় অর্থাৎ অতি শীঘ্র উদ্ধারকারী হয়, সেই কার্য করে ; তাকেই বুদ্ধিমান বলা হয়।

যেমন এক ব্যক্তি জমিদারের একটি খনি এক বৎসরের জন্য ঠিকা নিল। সেই খনিতে পাথর, কয়লা ও বহুমূল্য হীরা-পান্না ভরা আছে। বিনিযুক্ত ব্যক্তি তার থেকে হীরা, পান্না কেটে নিতে পারে আবার পাথর-কয়লা কাটতে পারে ; অথবা কোনো কিছুই বার নাও করতে পারে অথবা তাতে বাইরের আবর্জনা ভরে দিতে পারে—সবই তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। জমিদারের দিক থেকে তাকে অনুমতি দেওয়া আছে। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি তো সে যে তার থেকে বহুমূল্য হীরা, পান্না, রত্ন বার করে। যে কয়লা বা পাথর বার করে সে তো মূর্খ আর তার থেকেও বড় মূর্খ সেই ব্যক্তি যে খনি থেকে কিছুই বার করে না কেবল তাতে বাগান তৈরী করে। আর সব থেকে বড় মূর্খ সে, যে তার থেকে কিছুই বার করে না বরং তাতে আবর্জনা জমা করে। এইভাবে ভগবান আমাদের দেহরূপ ক্ষেত্র (জমি) দিয়েছেন। যে এটি তত্ত্বত বুঝে সে সর্বোত্তম কাজে সংযুক্ত হয়। নবধা ভক্তির নানা রকমের অঙ্গই নানা প্রকারের রত্ন। যে সর্বাগ্রে তা আহরণ করে, সেই চতুর। যে এই দেহকে স্ত্রী, পুত্র, ধনসম্পদ জড়ো করতে ব্যবহার করে সে পাথর-কয়লা নিষ্কাষণকারী সম মূর্খ। যে তা সুসজ্জিত করতে সংযুক্ত হয় সে পুষ্পোদ্যান সৃষ্টিকারী সম অধিক মূর্খ ; আর যে তাতে আবর্জনা জমা করে সে আরও মূর্খ। যে সময়কে ছলচাতুরি, চুরি, ব্যভিচার আদি পাপ কার্যে ও লোকেদের নিন্দা করাতে সময় ব্যয় করে, সে যেন খনিতে আবর্জনা ভরাট করে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি সময় থাকতে নিজের কাজ গুছিয়ে নেবে। দেহ তো বিনাশশীল ; যতদিন তার অধিকার পাওয়া গিয়েছে ততদিন তা টিকবে—যত শ্বাসপ্রশ্বাস বাঁধা আছে ততই পাওয়া যাবে। তাতেই যত বেশি সর্বোত্তম কাজ করে নেওয়া যায় তাই সর্বোৎকৃষ্ট হবে। তা নাহলে সময় চলে গেলে আপশোস ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকবে না।

শ্রীতুলসীদাস বলেন—

সো পরত্র দুখ পাবই সির ধুনি ধুনি পছিতাই।
কালহি কর্মহি ঈশ্বরহি মিথ্যা দোষ লগাই।।

আমাদের ভাবা উচিত যে এই দেহ কেন পেলাম ! আমরা তা পেয়েছি ঈশ্বর লাভ করবার জন্য। আমাদের এখন যে সকল কার্যে সময় কাটে তা প্রায় ব্যর্থই কেটে যায়। যে কার্য দেহ ও ইন্দ্রিয় দ্বারা হয় তার বিশেষ মূল্য নেই। যে কর্ম মন দ্বারা হয় তাই দামি হয়। আমাদের দেখা উচিত যে আমাদের মন কী করছে। আপনি নিয়ম করে পূজায় বসেছেন কিন্তু যদি আপনার মন পার্থিব জগতে পরিভ্রমণ করে তাহলে তা দামি নয়। এক কবি বলেছেন—

মালা তো করমেঁ ফিরৈ, জীভ ফিরৈ মুখ মাহিঁ।
মনুবাঁ তো চহুঁ দিসি ফিরৈ, যহ তো সুমিরন নাহিঁ।।

অতএব বিচার করা প্রয়োজন। ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে মন ভজনে এক আনাও লাগে না, স্বার্থে দুই-তিন আনা লাগে আর অবশিষ্ট বারো আনা তো ব্যর্থই যায়—অর্থাৎ আলস্য, প্রমাদ, ভোগ, পাপ ও ব্যর্থ চিন্তায় খরচ হয় যাতে আমাদের ইহলোকে লাভ হয় না পরলোকেও হয় না, উলটে ক্ষতিই হয়। তাই বিবেক দ্বারা বিচার করে নিজেকে শোধরাবার চেষ্টা করা উচিত। আপনি এটি না করলে, কে করবে ? এই কাজ অতিশয় জরুরি আর আপনাকেই তা করতে হবে, অন্য কেউ তা করতে পারবে না। আপনি যদি চান যে আপনার আত্মার উদ্ধার সম্পদ দ্বারা, সেবক দ্বারা, বন্ধু দ্বারা বা আত্মীয়স্বজন দ্বারা করিয়ে নেবেন তা কখনো হওয়ার নয়, তা তো আপনাকেই করতে হবে। অতএব সব কাজ ছেড়ে প্রথমে এই কাজ করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে যে আত্মউদ্ধাররূপ এই কার্য অন্য কোনো যোনিতে হওয়া সম্ভব নয়। অন্য সব তো ভোগ যোনি। যখনই উদ্ধার হবে এই মানব-জীবনেই হতে পারে, এই মানবজীবন আবার কবে লাভ হবে তার কোনো ঠিক নেই। অন্য জাগতিক কার্যে যদি কিছু বাকিও থাকে তাহলে তা আপনার উত্তরাধিকারী করে নেবে ; আর কেউ না করলেও ক্ষতি নেই ; কিন্তু সাধনায় ঘাটতি থেকে গেলে তা তো কেউ পূরণ করতে পারবে না। আত্মোদ্ধারের একটুও অবশিষ্ট থেকে গেলে তা আপনার জন্য খুবই

ক্ষতিকর হবে। আপনি জাগতিক কার্যকেই অজ্ঞানতার বশীভূত হয়ে আসল কাজ ভেবে বসে আছেন, কিন্তু তা আপনার বিশাল ভুল। এইখানকার কোনো বস্তু আপনার সঙ্গে যাবে না। আগেও আপনি তাদের সঙ্গে আনেননি এবং যাওয়ার সময়ও আপনার সঙ্গে কিছুই যাবে না। মৃত্যুর পর সব এইখানেই থেকে যাবে ; কেবল পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ প্রাণ মন ও বুদ্ধি—এই সতেরো তত্ত্ব আপনার সঙ্গে যাবে। যা সঙ্গে যাবে তাকেই ভালো করবার চেষ্টা করুন। এতে উত্তম গুণ ও আচরণরূপ সম্পদ ভরে নিন যাতে এখানেই মুক্তি লাভ হয়। যদি কোনো কারণে কিঞ্চিৎ ঘাটতি থেকে যায় তাহলে যোগভ্রষ্ট হয়ে পরের জন্মে উদ্ধার হয়ে যাবে। তাই আমাদের অন্তরে দৈবী সম্পদের গুণ ও আচরণই সঞ্চয় করা উচিত। আসুরী সম্পদরূপী অবগুণ ভরা তো আবর্জনা একত্র করা। যা কদর্যভাব ও নিকৃষ্ট কর্ম তা বিদূরিত করা উচিত। যেমন কোনো রমণীকে দেখে আমাদের মনে খারাপ ভাব আসে তাহলে তা বার করে দিয়ে নয়নে অঞ্জন লাগিয়ে নেওয়া উচিত। অঞ্জন কী ? তাকে মা, ভগিনী, অথবা কন্যারূপে ভাবাই অঞ্জন ধারণ করা ও দেখা। এইভাবে কর্ণ, বাণী আদি সকলকে ভগবানের নাম, রূপ ও গুণের শ্রবণ-কীর্তনে পবিত্র করে দেওয়া উচিত আর অন্তরে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, প্রভাব, লীলা এবং ভক্তের চরিত্র আদি উত্তম বস্তু দ্বারা পূর্ণ করা উচিত। যদি আমরা এমন না করি তাহলে আমাদের কল্যাণ কেমন করে হবে ? এক কবি বলেছেন—

জাকী পূঁজী সাঁস হৈ, ছিন আবৈ ছিন জায়।
তাকো ঐসো চাহিএ, রহৈ রাম লৌ লায়॥

এই মূলধনে সর্বোত্তম লাভ করা প্রয়োজন। এই মানবদেহই ক্ষেত্র অর্থাৎ কর্মভূমি অন্যসব যোনি তা বন্ধ্যাভূমি। এতে আপনি মেওয়া চাষ করতে পারেন আবার কোন কিছু না করে সম্পদের অপচয়ও করতে পারেন। মেওয়া কী ?

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৭।৫।২৩)

'ভগবান বিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ এবং প্রভাবাদির শ্রবণ, কীর্তন, ভগবানের পদসেবা, পূজা, বন্দনা, দাসভাব, সখাভাব ও সমর্পণই—এই নয় প্রকার ভক্তি।'

এই নয় প্রকারের ভক্তিই মেওয়া। ভক্তির এই নয় প্রকারের অঙ্গের একটা করে নিলেও ভগবান লাভ হবে ; আর যার এই নয়টি ভাব আছে তাকে তো বলবার কিছুই নেই। তা তো অতি উত্তম।

কেবল শ্রবণ ভক্তি দ্বারা রাজা পরীক্ষিৎ ও ধুন্ধুকারী আদি ; কীর্তনে নারদ, তুলসীদাস, সুরদাস, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আদি ; স্মরণে ধ্রুব আদি ; পাদসেবনে লক্ষ্মী, ভরত, কেবট (নৌকো চালক) আদি ; পূজা দ্বারা পৃথু, দ্রৌপদী, গজেন্দ্র, ভীল রমণী, রন্তিদেব আদি, নমস্কারের মাধ্যমে অক্রূর আদি ; দাস্যভাবে হনুমান আদি ; সখ্যভাবে সুগ্রীব, অর্জুন আদি এবং আত্মনিবেদনে বলি আদি ঈশ্বর লাভ করেছেন।

অতএব আমাদের এই কথা বিশ্বাস করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই কার্য সম্পন্ন করা উচিত, যার জন্য আমাদের এই মানবজন্ম লাভ হয়েছে। ভাগবতকার সাবধান করে বলেছেন—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্ নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ॥

(১১।৯।২৯)

'এই মানবদেহ অনিত্য হলেও পরম পুরুষার্থের সাধন বা পথ। তাই বহু জন্ম পর এই দুর্লভ নরদেহ লাভ করে বুদ্ধিমান মানুষের জন্য কাম্য হবে যে যতক্ষণ পর্যন্ত এই দেহ আবার মৃত্যুর কবলে না পড়ে তার মধ্যেই যত শীঘ্র নিজের কল্যাণ হয় তার চেষ্টা করে নেওয়া কারণ বিষয় তো সকল যোনিতেই পাওয়া যায় (তা সংগ্রহ করতে এই অমূল্য সুযোগ কখনই হারাবে না)।'

———o———

ভগবৎকৃপা

(অনুক্ষণ কৃপা দর্শনের উপায়)

একজন প্রশ্ন করেছেন—ভগবৎকৃপা সহেতুক হয় না অহেতুক ? মানব সকল অবস্থাতেই ভগবানের দয়ার দর্শন কেমন ভাবে করবে ?

এর উত্তরে আমি বলি—ভগবৎকৃপার মহত্ত্ব বর্ণনা করে বোঝানো অসম্ভব কারণ ভগবানের দয়ার মহত্ত্ব অসীম আর বাণীদ্বারা যা কিছু বলা যায় তা অল্পই ; ভগবানের কৃপা রহস্যকে যে মহাপুরুষ যৎকিঞ্চিৎ বোঝেন তাও বলে অন্যকে বোঝানো যায় না। সকল জীবের উপর ভগবানের কৃপা সতত অপার। লোকজন এই বিষয়ে যতটা অনুমান করেন ভগবানের কৃপা তার থেকে অনেক অনেক বেশি।

বস্তুত ভগবানের দয়া প্রাণীকুলের উপর বিনা কারণে সমভাবে সতত স্বাভাবিকই হয়ে থাকে তাই তাকে অহেতুক বলাই শ্রেয়। কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবানের দয়ার উপরে যত বেশি বিশ্বাস করে তা নিজের উপর স্বীকার করে, সে সেই দয়া তত্ত্বকে তত বেশি বোঝে আর তার তত বেশি প্রত্যক্ষ লাভ হয় ; তাই তাকে সহেতুকও বলা যেতে পারে কিন্তু ভগবানের এতে নিজস্ব কোনো হেতু নেই।

ভগবান তো সতত পূর্ণকাম, সর্বশক্তিমান, মহান ঈশ্বর। তাঁর মধ্যে কোনোরূপ কামনা অথবা ইচ্ছার কল্পনা থাকাও অসম্ভব। অতএব তাঁর দয়াতে যৎকিঞ্চিতও স্বার্থ থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই। তিনি তো স্বাভাবিকভাবেই অহেতুক পরম দয়ালু, সকলের সুহৃদ্ ; তাঁর সকল ক্রিয়া সকল জীবের কল্যাণের প্রয়োজনে হয়ে থাকে ; বস্তুত অকর্তা হয়েও তিনি দয়াবশতঃ জীবের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেন। তিনি জন্মবিরহিত হয়েও সাধুপুরুষদের উদ্ধার, ধর্মের প্রচার এবং দুষ্টের

সংহার[১] করবার জন্য এবং জগতে নিজ পবিত্র লীলা বিস্তার করে লোকেদের মধ্যে প্রেম ও শ্রদ্ধা সঞ্চার করবার জন্য যথাকালে অবতার দেহ ধারণ করেন ; নির্গুণ, নিরাকার হয়েও নিজ ভক্তের প্রেমাধীন হয়ে সগুণ ও সাকাররূপে দর্শন দেওয়ার জন্য বাধ্য হন ; সর্বেশ্বর, সর্বশক্তিমান এবং সতত স্বতন্ত্র হয়েও প্রেমে বিগলিত হয়ে ভক্তের অধীন হয়ে যান ; এই সকল কার্যে তাঁর অহেতুক পরম দয়াই হল একমাত্র কারণ।

যে ভগবদ্ভক্ত ভগবানকে লাভ করেছেন, যিনি ভগবানের দয়ার মহত্ত্ব বুঝে গিয়েছেন, যাঁর মধ্যে সেই দয়াময় পরমেশ্বরের দয়ার অংশ অধিষ্ঠিত হয়েছে সেই মহাপুরুষদেরও অপর জীবের প্রতি কোনো রকম স্বার্থের সম্বন্ধ থাকে না। সেই মহাপুরুষের সমস্ত কর্ম লোকহিতার্থে, কোনো রকম ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়াই সম্পাদিত হয়, তাহলে ভগবানের দয়া যে পূর্ণতঃ স্বার্থশূন্য হবে, এতে বলার কী আছে ? মহাপুরুষের কারো সঙ্গে কোনো প্রকারের স্বার্থের সম্পর্ক থাকে না।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥

(গীতা ৩।১৮)

'সেই মহাপুরুষের ইহজগতে কোনো কর্ম করা বা না করার কোনো প্রয়োজন থাকে না এবং কোনো প্রাণীর সঙ্গে তাঁর কিঞ্চিৎমাত্রও স্বার্থের সম্পর্কও থাকে না। তবুও তাঁর দ্বারা কেবল লোকহিতার্থ কর্ম করা হয়ে থাকে।'

এইভাবে নিজের সম্বন্ধেও ভগবান বলেন—

---

[১]সংহারের মাধ্যমেও ভগবান কল্যাণ করে থাকেন। বলা হয়েছে—

লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে।
তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণ-দোষয়োঃ॥

যেমন সন্তানকে ভালোবাসা অথবা শাসন করা— উভয়তেই সন্তানের প্রতি মায়ের সমান স্নেহ থাকে, তেমনই জীবের গুণ-দোষ নিয়ন্ত্রণকারী ভগবানের তাদের প্রতি সমান দয়া থাকে।

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানাবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥

(গীতা ৩।২১)

'হে অর্জুন! আমার ত্রিলোকে কোনো কর্তব্য নেই এবং প্রাপ্তব্য কোনো বস্তুই অপ্রাপ্ত নেই তথাপি আমি কর্মে ব্যাপৃত থাকি, কর্মত্যাগ করি না।'

এই প্রসঙ্গে আমরা গোস্বামী তুলসীদাসকে বলতে শুনি—

হেতু রহিত জগ যুগ উপকারী। তুম্হ তুম্হার সেবক অসুরারী॥
স্বারথ মীত সকল জগ মাহীঁ। সপনেহুঁ প্রভু পরমারথ নাহীঁ॥

এই বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, মহাপুরুষদের ও ভগবানের কোনো কর্তব্য এবং প্রয়োজন না থাকলেও লোকেদের উন্মার্গ থেকে রক্ষা করবার জন্য এবং নীতি, ধর্ম এবং ঈশ্বরভক্তিরূপ সন্মার্গতে যুক্ত করবার জন্য কেবল লোকহিতার্থ তাঁদের দ্বারা কার্যসকল সম্পাদিত হয় ; তাতে তাদের অপার দয়াই কারণ হয়ে থাকে।

ভগবান পরম দয়ালু এবং সর্বশক্তিমান হয়েও সমদর্শী ও নিঃস্পৃহ হওয়ায় তাঁর দ্বারা নিজে থেকে কোনো কার্যের প্রারম্ভ করা হয় না। শ্রদ্ধা-প্রেমপূর্বক শরণাগত হওয়ায় ভক্তের হিতার্থে তাঁর মধ্যে ক্রিয়ার প্রাদুর্ভাব এবং দয়ার বিকাশ হয়।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে যে যদি ভগবানের সমভাবে সকল জীবের উপর অপার দয়া থাকে তাহলে সকল জীবের কল্যাণ কেন হয় না ? বিবেচনা করলে এই উত্তর পাওয়া যায় যে, তাঁর দয়াতত্ত্বকে না জানবার জন্য লোকেরা সেই দয়া থেকে বিশেষ লাভান্বিত হন না। যেমন জগত্তারিণী ভাগীরথী গঙ্গার প্রবাহ লোকহিতার্থ সতত প্রবাহিত হতেই থাকে তবুও যে গঙ্গার প্রভাবকে জানে না এবং শ্রদ্ধা-ভক্তির অভাব হেতু স্নান-পানাদি করে না, সে গঙ্গা থেকে বিশেষ লাভ পায় না ; এই ভাবেই ভগবানের দয়ার প্রভাব অহর্নিশ—গঙ্গাপ্রবাহ থেকেও বেশি সর্বত্র প্রবাহিত হয় তবুও মানুষ তার প্রভাব না জেনে এবং শ্রদ্ধা ভক্তির অভাবে ভগবানের শরণাগত হয় না ফলে তাঁর দয়াও বিশেষ কাজে লাগে না।

সমান ভাবে ভগবানের দয়ার সাধারণ লাভ তো সকল জীব পেয়ে থাকে কিন্তু যে সেই দয়ার পাত্র হয় সে তার থেকে বিশেষ লাভ পেয়ে থাকে। সূর্যের আলোক ও রৌদ্র সর্বত্র সমভাবে সকলে লাভ করে তাই সমানভাবে তার আলো সকলে পায় কিন্তু সূর্যমুখী কাচে (আতশ কাচে) তাঁর শক্তি বিশেষ ঘনীভূত হয় যার ফলে তৎক্ষণাৎ অগ্নির আবির্ভাব হয়। সূর্যমুখী কাচের মতন যার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, যার অন্তঃকরণে ভগবানের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রেম হয় সে তাঁর দয়া থেকে বিশেষ লাভান্বিত হতে পারে।

মানুষের সঞ্চিত, প্রারব্ধ এবং ক্রিয়মাণ—তিন প্রকারের কর্মের সঙ্গেই ভগবানের দয়ার সম্বন্ধ থাকে—পূর্বকৃত পুণ্যকর্ম সঞ্চয় ভগবানের দয়াতেই হয়েছে আর সেই সঞ্চিত কর্মানুসারে প্রারব্ধ ভোগের বিধান ভগবান দয়াপূর্বকই জীবের হিতেই করে থাকেন। তাই ভগবানের দয়া-রহস্য যে জানে সে ভাগ্যবশতঃ সুখ-দুঃখের পরিস্থিতিতে সতত ভগবানের দয়া দর্শন করে থাকে। ক্রিয়মান শুভকর্মও ভগবানের দয়াতেই হয়, তাঁর দয়াতেই মানুষ সন্মার্গ পথে অগ্রসর হতে পারে। অতএব সকল কর্মেই ভগবানের দয়ার নিত্য সম্বন্ধ থাকে।

শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে বিচার করলে ক্ষণেক্ষণে—পদেপদে সতত মানুষ ভগবানের দয়ার দর্শন পেতে পারে। সকল জীবদের জল, বায়ু, প্রকাশ আদি তত্ত্ব থেকে সুখ হয়, তাদের জীবন নির্বাহ হয়, খাওয়া-পান কার্য সম্পন্ন হয়—এই সবের মধ্যে ঈশ্বরের সমান দয়া ব্যাপ্ত থাকে।

মানুষের শুভাশুভ কর্মানুসার ফলভোগের ব্যবস্থা করে দেওয়ার মধ্যে ভগবানের দয়ার হাত থাকে।

অল্প জপ, ধ্যান ও সাধুসঙ্গ করলেও মানুষের জন্ম-জন্মান্তরের পাপের নাশ হওয়ার যে রীতি ভগবান সৃষ্টি করেছেন তাতে তো ভগবানের অপার দয়াই পূর্ণ আছে।

শরণাগত হয়ে প্রেম ও করুণাভাবে প্রার্থনা করলে ভগবানের আবির্ভূত হওয়া, ভক্তের সর্বপ্রকারের দুঃখ ও সংকট দূর করা, সর্বভাবে শরণাগতকে রক্ষা করা, পাপকর্ম থেকে ভক্তকে রক্ষা করা—এই সকল ভগবানের বিশেষ

দয়ারই প্রদর্শন। ইচ্ছা ও প্রার্থনা ছাড়াই ভক্ত প্রহ্লাদসম দৃঢ় বিশ্বাস ধারণকারী ভক্তের হিতার্থে স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে দর্শন দেওয়া, বিভিন্ন সংকটে তাকে রক্ষা করা—ভগবানের দয়ার অতিশয় বিশেষ প্রদর্শন।

মহাত্মা এবং শাস্ত্র দ্বারা বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে লোকেদের অন্তঃকরণে প্রেরণা সৃষ্টি করে অথবা স্বয়ং অবতার নিয়ে ভক্তকে অসৎ কর্ম থেকে সরিয়ে সৎ কর্মে নিযুক্ত করা, এও ভগবানের বিশেষ দয়া প্রদর্শন।

স্ত্রী, পুত্র, সম্পদ ও গৃহ আদি জাগতিক পদার্থের প্রাপ্তি এবং তার বিনাশ হওয়ায় এবং শরীর-স্বাস্থ্য ঠিক থাকা, না থাকা ; রোগ ও সংকটাদি লাভ এবং তার বিনাশে তথা সুখসম্পত্তি ও দুঃখ প্রাপ্তিতেও —প্রতি অবস্থাতে মানুষের দয়ার দর্শন করবার অভ্যাস করা উচিত।

স্ত্রী, পুত্র, সম্পদ ও গৃহাদি জাগতিক পদার্থের বৃদ্ধিতে ভাবা উচিত যে ভগবান পূর্বকৃত পুণ্যকর্মের ফলে এই সকল বস্তু অন্যদের সুখ প্রদান করবার জন্য, শ্রেষ্ঠ কর্ম সম্পাদন করবার জন্য, ভগবানের প্রতি প্রীতি বৃদ্ধি করবার জন্য এবং সর্বভাবে ঈশ্বরভক্তিতে তা প্রয়োগ করবার জন্যই দিয়েছেন। এই ভেবে যে সেই জাগতিক বস্তুসকলের সঙ্গে শুধুমাত্র দেহ-নির্বাহ পর্যন্ত সম্পর্ক রাখে এবং সেই সকলকে ঈশ্বরের জন্যই অর্পণ করে, সেই ঈশ্বরের দয়ার রহস্য সঠিকভাবে বুঝতে পারে। যে সেই সকল বস্তু ভোগে ব্যয় করে সে ভগবানের দয়ার তত্ত্ব ঠিক বুঝতে পারে না।

এই সকল জাগতিক পদার্থের বিনাশের সময়ে মনে করা উচিত যে এই সকলের প্রতি আমার ভোগবুদ্ধি ও আসক্তি হওয়ায় তা ঈশ্বরভক্তির অন্তরায় হয়ে ছিল। অতএব পরম দয়ালু ভগবান দয়া করে নিজের দিকে আকর্ষণ করবার জন্য এই সকলকে সরিয়েছেন, এতে ভগবানের পরম দয়া নিহিত। যেমন জগতে দেখা যায় যে পতঙ্গ অথবা অন্য কোনো সেই জাতীয় জীব আলো এবং আগুন দেখে তার উপর আসক্ত হয়, মোহবশত তাতে লাফিয়ে পড়ে আর ভস্ম হয়ে যায়। তাদের এইরূপ করুণ অবস্থা দেখে দয়ালু ব্যক্তি সেই অগ্নি বা আলোকে সেইখান থেকে সরিয়ে দেয় বা নিভিয়ে দেয় ; এই কার্যে সেই ব্যক্তির পতঙ্গের উপর মহান দয়া থাকে, যদিও পতঙ্গ তা বুঝতে

পারে না ; সে ভাবে যে, সেই আলোক যে সরিয়ে দিয়েছে সে অতিশয় নির্দয় ও মহান শত্রু ; কিন্তু এটা তার অজ্ঞান ও ভ্রম ; এইভাবে অবুঝ মানব—যে ঈশ্বরের দয়ার রহস্য জানে না, সেও এই সকল জাগতিক বস্তুর অভাবে নানা ভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশে দোষারোপ করে কিন্তু ভগবান তো পরম দয়াময় তাই তিনি তার অপরাধের দিকে লক্ষ্য করেন না। অপর দিকে এক্ষেত্রে যারা মনে করে যে ভগবান আমার উপর পরম দয়া করে পূর্বকৃত পাপকর্ম থেকে নিষ্কৃতি দান করবার জন্য, ভবিষ্যতে পাপ থেকে রক্ষা করবার জন্য এবং সকল ভোগ সামগ্রী প্রত্যক্ষ ক্ষণভঙ্গুর দেখিয়ে তাতে বৈরাগ্য উৎপন্ন হেতু এই সকলের বিয়োগ করেছেন—এই ভেবে জাগতিক ভোগ পদার্থের বিয়োগেও ভগবানের দয়া দর্শন করে সদা প্রসন্ন থাকে সেই তাঁর দয়ার রহস্যকে ঠিক ভাবে বুঝতে পারে।

এমনই যখন দেহ আরোগ্য থাকে তখন ভাবা উচিত যে ভগবানকে সর্বব্যাপী মনে করে সর্বত্র ভগবান দর্শন করে অপরের সেবা করবার জন্য, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গ করে ভগবানের গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব এবং রহস্যকে বোঝবার জন্য এবং তাঁর ভজন-ধ্যান সতত অভ্যাস করবার জন্য ভগবান দয়া করে আমাকে সুস্থ রেখেছেন। এই মনে করে এই ক্ষণভঙ্গুর দেহকে যে পরম দয়ালু পরমাত্মার কার্যে উপরোক্ত উদ্দেশ্যানুসারে যুক্ত করে সেই তাঁর দয়া-রহস্য ঠিক ভাবে অনুভব করে।

দেহ রোগগ্রস্ত হলে মনে করতে হবে যে পূর্বকৃত পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, ভবিষ্যতে পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, দেহে বৈরাগ্য উৎপন্ন করবার জন্য এবং রোগাদিতে তপ বুদ্ধি করে তার লাভ প্রদান করবার জন্য এবং বারে বারে নিজ স্মৃতি দান করবার জন্য ভগবান পরম দয়া করে পুরস্কাররূপে এই অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। এইরকম মনে করে রোগাদি লাভেও কোনোরূপ চিন্তা না করে যে আনন্দে নিজ মনকে ভগবানের চিন্তায় যুক্ত করে এবং ভগবানের এমন উদ্দেশ্য মনে করে সতত আনন্দে থাকে সেই ভগবানের দয়ার রহস্য ঠিক ভাবে বোঝে।

এইভাবে সুখী ও দুঃখী, মহাত্মা ও পাপী জীবের সঙ্গে মিলন ও বিচ্ছেদ

হওয়ার সময়ে এবং তাদের সঙ্গে কোনো ভাবে সম্বন্ধ হওয়ার সময়ে সতত ভগবানের দয়া দর্শন করা উচিত।

উত্তম পুরুষের সঙ্গে দেখা হলে মনে করা উচিত যে তাঁর গুণ ও আচরণ-সকল অনুকরণ করাবার জন্য, তাঁর উপদেশসকল গ্রহণ করে ভগবানের প্রতি প্রেম বৃদ্ধি করবার জন্য তিনি পরম দয়া করে এঁর সঙ্গ দান করেছেন।

তাঁর সঙ্গে বিয়োগ হলে ভাবা উচিত যে এমন ব্যক্তির সঙ্গ সতত লাভ করা দুর্লভ, এই কথা বোঝাবার জন্য আবার তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার উৎকট ইচ্ছা উৎপন্ন করবার জন্য এবং তাঁতে প্রীতি বৃদ্ধি করবার জন্য ভগবান দয়া করেই তাঁর সঙ্গে বিয়োগ করান।

দুষ্ট, দুরাচারী ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলে ভাবা উচিত যে দুরাচার থেকে যা ক্ষতি হয় তা প্রত্যক্ষ দেখিয়ে, দুর্গুণ ও দুরাচারে বিরক্তি উৎপন্ন করবার জন্য ভগবান এমন ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করান।

তাঁর বিয়োগে ভাবা উচিত যে কুসঙ্গ দোষ থেকে রক্ষা করবার জন্যই ভগবান দয়া করে এমন দুরাচারী ব্যক্তির সঙ্গে বিচ্ছেদ করিয়েছেন।

দুঃখী ব্যক্তি ও প্রাণীর সঙ্গে দেখা হলে ভাবা উচিত যে অন্তঃকরণে করুণাভাবকে বৃদ্ধি করবার জন্য, তার সেবার সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং সংসারে বৈরাগ্য উৎপন্ন করবার জন্য দয়াময় ভগবান দয়া করে এদের সঙ্গে দেখা করান।

সুখী ব্যক্তির ও জীবের সঙ্গে দেখা হলে ভাবা উচিত যে এদের সকলকে সুখী দেখে প্রসন্ন হওয়ার শিক্ষা দান করবার জন্য ভগবান দয়া করে এঁর সঙ্গে দেখা করিয়েছেন।

এদের সকলের বিয়োগে ভাবা উচিত যে জনসমুদায়তে আসক্তি দূর করে, সংসারে পরম বৈরাগ্য উৎপন্ন করবার জন্য এবং একান্তে থেকে ভজন-ধ্যানের দৃঢ় অভ্যাস করবার জন্য ভগবান দয়া করে এমন সুযোগ দিয়েছেন।

এইভাবে অন্য সকল ঘটনায় সতত, সকল অবস্থায় ভগবানের দয়া

দর্শন করা উচিত। এমন অভ্যাস করে মানুষ, সকল জীবের উপর ভগবানের যে অপার দয়াপ্রবাহ অব্যাহত আছে—সেই রহস্য অনুধাবন করে তার থেকে বিশেষ লাভবান হতে পারে।

দয়াময় পরমেশ্বরের সকল জীবের উপর এত দয়া বর্তমান যে পূর্ণরূপে মানুষ তা বুঝতেই পারে না ; মানুষ নিজ বুদ্ধিতে নিজের উপর যত বেশি দয়া অনুভব করে তার পক্ষে ততটাই যথেষ্ট ; ঈশ্বর কৃপাকে মানুষ যথার্থরূপে কল্পনাই করতে সক্ষম নয়।

লোকে ভগবানকে দয়ার সাগর বলে কিন্তু বিচার করলে বোঝা যায় যে এই উপমা পর্যাপ্ত নয় ; তার অপার দয়ার কিঞ্চিৎ পরিচয় মাত্র। সমুদ্র পরিমিত, সীমাবদ্ধ আর ভগবানের দয়া অসীম এবং অপার তবুও জগতে সমুদ্র থেকে বড় কিছু প্রত্যক্ষ না হওয়ার জন্য লোকে তারই উপমা দিয়ে ভগবানের দয়ার মহত্বকে বোঝবার চেষ্টা করে।

এইভাবে সকল জীবের উপর ভগবানের অপার দয়া থাকলেও সেই রহস্যকে না বোঝবার জন্য মানুষ তার থেকে বিশেষ লাভ নিতে পারে না এবং নিজ মূর্খতার জন্য সতত দুঃখ পেতে থাকে।

ভগবানের দয়ার মহত্ব অপার ; যে ব্যক্তি তা থেকে যত নিতে চায়, ততটাই পেতে পারে এবং ভগবানের দয়া, তার রহস্য ও তত্ত্বকে না বুঝলেও তা সমানভাবে সাধারণ ফল দান করে ; তবে সে যত বেশি দয়ার রহস্য বুঝতে পারে তার কাছে তা তত বেশি ফলপ্রদ হয় এবং উপলব্ধি করে সেই অনুসারে কার্য সম্পাদন করলে আরও বেশি ফল লাভ হয়ে থাকে।

ভগবানের দয়ার প্রভাব এমন যে তার রহস্য ও তত্ত্বজ্ঞানীকে পরশপাথর সম স্বয়ং কার্য করিয়ে নেয় অর্থাৎ যেমন কোনো অজ্ঞ ব্যক্তির গৃহে পরশ পাথর থাকলেও সে তার গুণ না জানায় তাকে সাধারণ পাথরই ভাবে ফলে সে পরশপাথর থেকে বিশেষ লাভ পেতে সক্ষম হবে না। কিন্তু যদি হঠাৎ সেই পরশপাথরের লৌহের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সে পরশপাথর থেকে অধিকতর লাভও দিতে সক্ষম হবে। আবার যদি এমন অদ্ভুত আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখে বা কোনো গুণী ব্যক্তির দ্বারা নির্দেশিত হয়ে সে

সেই পরশপাথরকে সঠিকভাবে চিনতে পারে আর পরশপাথরের গুণ ও প্রভাবকে জেনে ফেলে তখন সেই জ্ঞান সেই ব্যক্তিকে পূর্ণফল প্রদান করে থাকে। এইভাবে যখন লোকে কোনো বিশেষ ঘটনা অথবা কোনো মহাপুরুষের সাধুসঙ্গ দ্বারা ভগবানের দয়ার রহস্য, তত্ত্ব ও প্রভাব কিছুটা জানতে পারে তখন সেই জ্ঞান তাকে স্বয়ং তদনুরূপ কার্য করিয়ে পূর্ণফল দান করে থাকে।

যে ব্যক্তি এই রহস্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয় আর জানতে পারে যে ভগবান পরম দয়ালু ও সকলের সুহৃদ তাহলে সে তৎক্ষণাৎ পরম শান্তি লাভ করে। ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥ (গীতা ৫।২৯)

'হে অর্জুন! আমার ভক্ত আমাকে তত্ত্বতঃ সর্বভূতের সুহৃদ অর্থাৎ স্বার্থ বিরহিত দয়ালু এবং প্রেমী জেনে শান্তি লাভ করে।'

হবে নাই বা কেন ? আমরা প্রত্যক্ষ দেখি যে যখন কোনো সাধারণ রাজাধিরাজ অথবা ধনী ব্যক্তির প্রতি আমাদের এই বিশ্বাস হয়ে যায় যে সেই রাজা অথবা মহাজন বড় দয়ালু ও ক্ষমতাশালী, সকলের উপর দয়া ভাব পোষণ করে এবং আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আর প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করতে ইচ্ছুক, তাহলে আমাদের কত আনন্দ হয়, কত নিশ্চিন্ত করে কত শান্তি দেয় এবং কত প্রচেষ্টা করে তার সঙ্গে দেখা করায় ও তার দয়া লাভ করবার চেষ্টা হয়ে থাকে। তাহলে যদি সর্বশক্তিমান, অসংখ্য কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু ভগবানের বিষয়ে এই বিশ্বাস হয়ে যায় যে ভগবান পরম দয়ালু, সকলের সুহৃদ, তিনি আমার সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করতে চান, আমার উপর তাঁর অপার দয়া, দর্শনেচ্ছুদের সঙ্গে তিনি দেখা করতে চান আর সেই শ্রদ্ধালু ভক্ত ভগবানের যদি সেই দয়া থেকে পরম লাভ পাবার চেষ্টা করে এবং পরম শান্তি লাভ করে তাহলে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এইভাবে ভগবানের দয়ার রহস্যের জ্ঞাতা স্বয়ং পরম দয়ালু ও সকলের সুহৃদ হয়ে যায়। তার ঈশ্বর লাভ হয় এবং সে ভগবানের অতিশয় প্রিয় ও ভগবানের সঙ্গে নিত্যযুক্ত হয়ে যায়।

সেই পরম দয়ালু সকলের সুহৃদ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের অপার দয়া আমাদের উপর স্বতঃ বর্তমান। প্রতিক্ষণে তাঁর দয়ার স্বাভাবিক লাভ আমরা পেয়ে থাকি। তিনি স্বয়ং অবতাররূপে আবির্ভূত হয়ে নিজ দয়ার প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়েছেন তাই তাঁর দিকে লক্ষ্য স্থির করে ভগবানের দয়ার রহস্য, প্রভাব এবং তত্ত্ব বোঝবার জন্য আমাদের তৎপর হয়ে যাওয়া উচিত। কারণ এই নরদেহ ভগবানের অকৃপণ দয়াতেই লাভ হয়েছে। এই দেহে জীব ভগবানের দয়াকে বুঝে তাঁর পরম প্রিয়পাত্র হতে পারে। প্রতিক্ষণে আয়ু ক্ষীণ হয়ে আসছে, এমন সুযোগ পাওয়া অসম্ভব। বয়ে যাওয়া সময় ফিরে আসে না, অতএব এমন অমূল্য মানব জীবনকে বিষয়ভোগে, মায়া- মোহতে, আলস্যে এবং প্রমাদে ব্যর্থ হারানো ঠিক নয়।

———o———

প্রেম ও সমতা

যদি আপনি কারো সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক বৃদ্ধির ইচ্ছা পোষণ করেন তাহলে স্বার্থ ও অহংকার ত্যাগ করে তাঁর হিতসাধনে রত হওয়া হল সর্বোত্তম সাধন বা উপায়। মানুষ যেমন নিজ হিতার্থে সর্বদা যত্নশীল থাকে তেমনই যার সঙ্গে প্রেম বৃদ্ধি করবার বাসনা হয় তার হিতের প্রতি সতত যত্নশীল থাকা উচিত।

প্রেমে লেশমাত্রও স্বার্থের সম্পর্ক থাকলে চলবে না। যখনই স্বার্থভাব জাগবে তখনই প্রেমের অবক্ষয় হতে শুরু হবে। বস্তুত স্বার্থ ও অহংকার—এই দুইই প্রেমপথের বিশাল প্রতিবন্ধক। ধরুন আমরা কারোর ভালোর জন্য কিছু করলাম আর তারপর জানিয়ে দিলাম যে, তার হিতসাধন করায় আমার কোনো স্বার্থ নেই। এইরূপ অহংকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমবীণার তার ছিন্নভিন্ন হতে শুরু হয়। আপনি হয়তো সেবা দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে রোগাদি সঙ্কটের থেকে রক্ষা করলেন অথবা অর্থ প্রভৃতির দ্বারা কারো বিপত্তি দূর করলেন—এই সকল হিতপূর্ণ কার্য প্রেম বৃদ্ধিতে পরম সহায়ক হয় কিন্তু যদি আপনি এই সেবাসকলকে কারো সামনে প্রকাশ করে ফেলেন তাহলে সব কিছুই পণ্ড হয়ে যায়। তাই কারো সেবা বা উপকার করে তা বলা উচিত নয় কারণ উপকার বলে তা প্রকাশ করলে অহংকার বৃদ্ধি পায় এবং অহংকারকে কেউ সহ্য করতে পারে না। মানুষ নিজে যতই অহংকার করুক কিন্তু সে অপরের অহংকার সহ্য করতে পারে না।

একটুও টক পড়ে গেলে যেমনভাবে দুধ কেটে যায় সেইভাবে উত্তম সেবারূপ দুধে অহংকারে পূর্ণ টক পড়লে সকল সেবাই ব্যর্থ হয়ে যায়। সেবা ও হিতসাধনের আধার হল প্রেম, প্রেমের আধার যদি ব্যর্থ হয় তাহলে প্রেম টিকবে কেমন করে ? তাই প্রেম বৃদ্ধির জন্য ও সেটিকে স্থায়ী করার জন্য নিঃস্বার্থ এবং নিরভিমান হয়ে সকলের হিতে নিত্যযুক্ত থাকা উচিত।

আমাদের মধ্যে স্বার্থ ও অহংকার চিন্তা বদ্ধমূল হয়ে আছে। বস্তুত এগুলি স্বার্থ ও পরমার্থ—উভয় প্রকারের অগ্রগতিতে অন্তরায়ের সৃষ্টি করে। ধরে নিন আমরা কোনো বিপদগ্রস্ত বন্ধুকে আর্থিক সাহায্য করলাম এবং তারপর কোনো অন্য সময়ে কোনো প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির সম্মুখে সেই সাহায্যের কথা ব্যক্ত করলাম। ঘটনাক্রমে সেই ব্যক্তির দ্বারা সেই কথা বিপদগ্রস্ত বন্ধুর কাছে পৌঁছে দেওয়া হল। এর পরিণাম কী হবে ? হবে এই যে, আমাদের প্রতি সেই বন্ধুর প্রেম কমে যাবে আর তার এই কথায় অনুতাপ হবে আর ভাববে তখন ওর সাহায্য নিয়ে বড় ভুল করেছি। সে মনে এই কথা ভেবে বারে বারে কষ্ট পাবে—'যদি জানতাম যে, সে সাহায্যের কথা অন্যের সামনে জাহির করে আমার আত্মসম্মানে এইভাবে আঘাত করবে তাহলে আমি তার সাহায্য কখনই নিতাম না।'

এভাবে আমরা এক প্রকৃত বন্ধুপ্রীতি ও সদ্‌ভাবনা খুইয়ে স্বার্থদৃষ্টিতেও নিজের ক্ষতি করে বসি। এইভাবেই নিজ সেবা ও সৎকার্যকে নিজ মুখে বলে ফেলে পরমার্থ লাভ থেকে বঞ্চিত হই। শাস্ত্রকারগণ এও বলেন যে নিজ উত্তম কার্য বলে ফেললে কর্ম সর্বতোভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়। রাজা ত্রিশঙ্কু নিজ মুখে স্বীয় প্রশংসা করে স্বর্গচ্যুত হয়েছিলেন। তাই আমাদেরও উচিত আমরা যা ভজন, ধ্যান, সেবা, পূজা এবং পরোপকারাদি উত্তম কার্য করি, তা যেন কখনো নিজ মুখে প্রকাশ না করি। জিজ্ঞাসা করলেও এই প্রসঙ্গে মৌন থাকা অথবা সেই প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যাওয়া শ্রেয়স্কর। মহিলাদের মধ্যে অধিকাংশত এই দোষ বেশি দেখা যায়। তারা সেবাদি উত্তম কার্য সাধারণত লুকিয়ে রাখতে পারে না। পুরুষও প্রেমের রজ্জু ছিন্নকারী এই বদ্‌স্বভাব হতে পূর্ণরূপে মুক্ত নয়। তাই আমাদের সকলের এই চেষ্টা সতত করা উচিত যে কারো উপকার করে সেটিকে কারো সামনে প্রকাশ না করা। যার উপকার করা হয় সে তো তা জানে, তাহলে সেটি অন্যের সামনে যদি প্রকাশ করে দেওয়া হয় তাহলে তাতে মান-প্রতিপত্তি লাভের ভাবই লুকিয়ে আছে বুঝতে হবে। না হলে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করে লাভ কী হয় ? তবে কারো প্রতি করা হিতের কার্য বললে যদি সেই উপকার লাভ করা ব্যক্তির লাভ হয় তা প্রকাশ করলে দোষ হয় না। কিন্তু এইরূপ পরিস্থিতি কদাচিৎই আসে। ধরা যাক

কারো দুই শত টাকা প্রয়োজন রয়েছে। সে আমাকে তা জানাল। আমি তাকে দুশত না দিতে পেরে পঞ্চাশ দিতে পারলাম। এখন বাকি একশত পঞ্চাশ টাকা পাইয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে যদি নিজের দেওয়া পঞ্চাশ টাকার প্রসঙ্গ কারো সামনে করতে হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের এই কথা প্রকাশ করা ক্ষতিকর না হয়ে সহায়ক হয় ; কারণ এমন করলে সেই ব্যক্তি আরো টাকা পেয়ে গেলে তার দুঃখ না হয়ে সুখই লাভ হয় আর আমাদের উদ্দেশ্যও অহংকারের না হয়ে হিতকরই হয়। তবে এমন করবার সময়ে কিন্তু আমাদের সাবধান হওয়া দরকার কারণ স্বার্থভাব কোনো না কোনো ভাবে এসে যেতে পারে। তাই এরূপ করার সময় মনের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয় যে সেই সেবাকে প্রচার করায় অহংকারের সূক্ষ্ম চিন্তা লুকিয়ে নেই তো !

আজকাল নিষ্কামভাব যেন লুপ্ত হয়ে গেছে। যেদিকে দেখি সেই দিকেই স্বার্থের প্রভুত্ব। বস্তুত স্বার্থ চিন্তা নিষ্কাম প্রেমের পক্ষে একটি কলঙ্ক। নিষ্কামভাবে করা কার্য অমৃতসম। ভগবৎ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যদি কারো সঙ্গে প্রেম করা হয় তাহলে তা ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত বলে ধরা হয় কিন্তু যদি সম্পদ, প্রতিষ্ঠা আদি জাগতিক বস্তু লাভের জন্য করা হয় তাহলে তা নিজের জন্য হয়, ঈশ্বরের জন্য নয়।

প্রেমের উৎপত্তি হয় সেবার মাধ্যমে। ভগবৎপ্রেমও লাভ হয় সেবা ও ভক্তির মাধ্যমে। ভক্তির স্থান সেবা থেকেও ঊর্ধ্বে। সেবা তো যে কারো করা যেতে পারে কিন্তু ভক্তি সকলের উপর হয় না। ভক্তিতে সেবা তো থাকেই কিন্তু তার সঙ্গে শ্রদ্ধা ও প্রেমও থাকে, প্রেমের মহত্ত্ব তো ভক্তিরও ঊর্ধ্বে। প্রেম হল ভক্তির ফল এবং সেটি অত্যন্ত ব্যাপক হয়ে থাকে। সেবার ফলও হল প্রেম জাগ্রত হওয়া।

প্রেমের প্রাপ্তি ভক্তি এবং উপকারের দ্বারা হতে পারে। তাই প্রেমেচ্ছু ব্যক্তি যেন যথাসাধ্য সকলের উপকার ও সেবা করবার জন্য তৎপর হয়। সেবা ও উপকারে প্রভেদ আছে। সেবায় তো বিনয় ভাবের আধিক্য ও অহংকারের অভাব থাকে কিন্তু উপকারে অহংকারের সমাবেশও আছে। অপরের হিতসাধনে রত থাকা ব্যক্তি স্বার্থ ও অহংকার সর্বতোভাবে ত্যাগ করবে। নিঃস্বার্থভাবে নিরহংকার থেকে সকলের সেবা করলে সকলের

প্রেম পাওয়া যায়। সেবক হয়ে যদি নিজের সেবা প্রচার করা হয়, তাঁর প্রতি কৃপা ভাবা হয়, তাহলে তো সেবার দামই কমে যায়— নিষ্কামভাবে কলঙ্ক লেপন করা হয়। যদি সেবা নিষ্কামভাবে করা হয় আর তা প্রকাশ করে দেওয়া হয় তাহলে তা সকাম সেবা হয়ে যায়। সেবা করে তা জনসমক্ষে প্রচার করলে সেবার মহত্ত্ব কমে যায় কিন্তু তার সঙ্গে যদি এও বলা হয় যে, সেবা নিষ্কামভাবে করা হয়েছে তাহলেও তার দাম আরও কমে যায়। নিষ্কামভাব তো অন্তরে লুকিয়ে রাখার উপযুক্ত এক গোপন নিধি, তা বলে বেড়াবার নয়।

আমাদের প্রেম উচ্চঃস্তরের নয়, সাধারণ স্তরের। যেখানে প্রেম বর্তমান থাকে সেখানে নিয়মের বাঁধন থাকে না। প্রেমের রাজ্যে সংকোচ, ভয় এবং সমাদরের কোনো স্থান নেই। মান-সম্মান, দ্বিধা ইত্যাদিরও সেখানে কোনো জায়গা নেই। এই সকলের যতই অভাব হয় ততই প্রেমকে দামি মনে করা হয়। প্রেম, প্রেমী ও প্রেমাস্পদ বস্তুত—এরা তিনই এক বস্তু। প্রেমাস্পদ প্রেমীর যত নিরাদর করে, ততই সেই প্রেমী আনন্দিত হয়। প্রেমীকে যতই কটুবাক্য বলা হয় বা তিরস্কার করা হয়, ততই তার প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেমের বৃদ্ধি হয়। যাকে আমরা বিনা দ্বিধায় তিরস্কার করতে পারি, নিঃসংকোচে কড়া কথা শোনাতে পারি—সেই প্রকৃত প্রেমী। যার মধ্যে প্রেমের অভাব, সে কড়া সমালোচনা অথবা নিন্দা সহ্য করতে পারে না। ধরুন আমি যদি কারো সামনে আপনার নিন্দা, দোষ সম্বন্ধে আলোচনা করি অথবা আপনার জিনিস অন্য কাউকে দিয়ে দিই কিংবা কারোর সামনে আপনার হয়ে দায়িত্ব নিই—এতদ্‌সত্ত্বেও যদি আপনার চিত্তে কোনো বিকার না হয়, তাহলে ধরা যেতে পারে যে আপনার আমার উপর প্রেম আছে। যদি প্রেমাস্পদ প্রেমীর বস্তুকে তার সম্মতি ছাড়াই কাউকে দিয়ে দেয় তাহলে প্রেমীর চিত্তে আনন্দ হয়। সে কখনো মনে করে না যে আমাকে জিজ্ঞাসা না করে আমার বস্তুতে কেন হাত দিল ! প্রেমীকে অতিশয় কঠিন কার্যে প্রেমাস্পদ নিযুক্ত করলে, এমনকি তার সম্মতি ছাড়া তার বলিদানও যদি করে দেয় তাহলেও প্রেমী প্রসন্নই থাকে। তার চিত্তে এত উল্লাস হয় যেন তার সাক্ষাৎ ঈশ্বর দর্শন হয়েছে কিন্তু এমন প্রেমী পাওয়া অতিশয় কঠিন।

যার প্রেম লাভ করবার ইচ্ছা তার দুটো কথা ভুলে যেতে হবে। অন্যের প্রতি করা উপকার আর অন্যের দ্বারা তার প্রতি করা অপকার। সংস্কাররূপেও এদুটির মনে থাকা নিষ্কামভাবে কলঙ্ক বলে গণ্য হয়ে থাকে। দুটো কথা কখনো ভুলতে নেই— (১) আমার প্রতি অন্যের করা উপকার এবং (২) আমার দ্বারা করা অন্যের অপকার। এই কথা দুটিকে আজীবন মনে রাখতে হয়। যে আমার উপকার করে তাকে মনে রাখলে আমার মনে তার উপকার করবার চিন্তা সতত থাকবে যা আমার আধ্যাত্মিক উন্নতিতে সহায়ক হবে। আমার দ্বারা যে অপকার হয়েছে তা মনে রাখলে মনে অনুশোচনা হবে। অনুশোচনা এক রকমের প্রায়শ্চিত্ত যা অন্তঃকরণের শুদ্ধি করে আমাদের কল্যাণ পথে অগ্রসর করে। উপকারে যদি আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকি তাহলে উপযুক্ত সময়ে আমরা সেই ঋণ থেকে মুক্ত হতে সচেষ্ট হব নিজের দ্বারা করা পাপ থেকে আমরা মুক্ত হতে পারব। বারে বারে জন্মগ্রহণ করবার দুইটি প্রধান হেতু থাকে— (১) পাপ ও (২) ঋণ। যে নিষ্পাপ ও ঋণমুক্ত সে তো স্বতই মুক্তস্বরূপ।

যদি আমরা কারোর উপকার করে তা না বলে মনে সংস্কাররূপেও ধারণ করি তবে সেটিও নিষ্কামভাবের পক্ষে— যেমন আগে বলা হয়েছে কলঙ্ক-রূপই। এইভাবে অন্যের দ্বারা নিজের প্রতি কৃত অপকারকেও যদি অন্তর থেকে পূর্ণরূপে সরিয়ে ফেলা না হয় তাহলে আমাদের মনে এই কথা সতত থেকে যাবে যে সেই অপকারী যদি দণ্ড পায় তাহলে ভালো হয়। অতএব প্রেম বৃদ্ধির জন্য কায়মনোবাক্যে নিষ্কামভাব তথা অহিংসা ও নিরহংকার হওয়া অতি আবশ্যক। যেখানে স্বার্থ ও অহংকার থাকে সেখানে প্রেম স্থায়ী হয় না।

ব্যবহারেও সমতা ভাব রক্ষা করা অতি আবশ্যক। জগতে সেই ব্যক্তিই ধন্য যে সমভাব লাভ করেছে। এই ভাবকে কার্যে বাস্তবায়িত করাই হল বস্তুত গৌরবের কথা। মানুষের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি তার আত্মীয়তা ও প্রেমভাব সমানভাবে থাকে। মাথা, হাত, পা আদি দেহের কোনো অবয়বের কষ্টের অনুভূতি মানুষের সমানভাবে হয়ে থাকে। এইভাবে যদি সকলের প্রতি মানুষের সুখ-দুঃখের অনুভূতি নিজ সুখ-দুঃখের মতন সমানভাবে হতে

শুরু করে তাহলে তাকে সমতা ভাব বলা যেতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই গীতায় বলেছেন—

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥

(গীতা ৬।৩২)

'হে অর্জুন ! যিনি সর্বত্র সমদর্শী হয়ে সর্বভূতের সুখ ও দুঃখকে নিজের সুখ ও দুঃখ বলে অনুভব করেন তাহলে আমার মতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।'

বস্তুত তাঁকেই মহাপুরুষ বলা হয় যিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে নিজ আত্মাকে সর্বব্যাপী দেখেন। এক দেশে অর্থাৎ দেহেই আত্মাকে সীমিত যে ভাবে, সে মহাত্মা নয়—অল্পাত্মা। সে মহাত্মাসম সমস্ত প্রাণীর সুখ-দুঃখ অনুভব করতে সক্ষম হয় না। তাতে সহানুভূতি ও সমবেদনার একান্ত অভাব থাকে। জ্ঞানদৃষ্টিতে সমদর্শী মহাত্মাদের স্থিতির বর্ণনা করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥

(গীতা ৬।২৯)

'সর্বব্যাপী অনন্ত চৈতন্যময় একীভাবেযুক্ত তথা সর্বত্র সমদর্শনকারী যোগী স্বীয় আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে স্বীয় আত্মায় দর্শন করেন।'

এই সমদর্শিতার স্থিতি—এই সমতার ভাব ভগবানের কৃপায় লাভ হতে পারে। তাই ভগবানকে স্মরণে রেখে এমনভাব লাভ করবার জন্য সতত চেষ্টা করা উচিত।

ভক্তির সিদ্ধান্তে এই বিষয়ে বিচার করলে সমগ্র জগৎকে ঈশ্বরের রূপ ভেবে নিলে সমতা ভাব লাভ হয়। শ্রীতুলসীদাস মহারাজ বলেন—

সো অনন্য জাকেঁ অসি মতি ম টরই হনুমন্ত।
মৈ সেবক সচরাচর রূপ স্বামি ভগবন্ত॥

বস্তুত ভগবানের সেই অনন্য ভক্ত যে সকল চরাচর ভূতসকলকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের রূপ মনে করে সকলের সঙ্গে সমত্বপূর্ণ ব্যবহার করে।

জ্ঞানদৃষ্টিতে এই ভাব থাকে যে এই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড আমারই আত্মা আর ভক্তির দৃষ্টিতে এই ভাব থাকে যে এই সকল আমার প্রভুরই রূপ এবং এই সকলের অর্থাৎ সর্বভূতের আমি সেবক।

দুই পথের মধ্যে যে কোনো একটিতেও সমত্ববুদ্ধি লাভ হলে মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে দয়া, বিনয় ও প্রেম আদি অতি উত্তম গুণের উত্তরোত্তর বিকাশ হতে থাকে এবং তার অন্তরের রাগ, দ্বেষ আদি সমস্ত বিকার নষ্ট হয়ে যায়। এমন রাগ-দ্বেষ বিরহিত মহাত্মা দ্বারা যে আচরণ হয় তা লোকেদের জন্য আদর্শ ও কল্যাণকর হয়ে থাকে। অতএব সমত্ব ভাব লাভ করবার জন্য সতত যাতে ভগবান স্মরণে থাকেন তার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা উচিত।

———o———
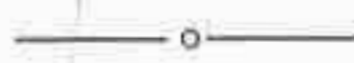
দয়াময় ঈশ্বর

ভগবান মানবের মঙ্গলসাধনে আর ভক্তদের বিশেষভাবে দৃঢ় করবার জন্য তাঁদের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। যদিও তিনি আমাদের অন্তরের প্রতিটি অভিপ্রায়কে ভালোভাবে জানেন তবুও যেমন শিক্ষক ছাত্রদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা জেনেও তাদের পরীক্ষা করেন তেমনভাবেই তিনি সতত আমাদের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। শিক্ষক তো সামগ্রিকভাবে বালকদের যোগ্যতা জানেন না তাই সেইখানে পরীক্ষা নেওয়ার যুক্তি আছে কিন্তু ভগবান তো অন্তর্যামী—সব কিছুই জানেন, তাঁর কিছুই অজানা নয়।

আমরা যাকে বিপদ-আপদ বলি তা বস্তুত ভগবানের দ্বারা বিহিত এবং তা উপস্থিত হয় ক্রমাগত আমাদের শক্তসামর্থ্য আর উত্থান সুনিশ্চিত করবার জন্য। অনিচ্ছা ও পরের ইচ্ছায় যে পরিস্থিতি উপস্থিত হয় তাকে ভগবানের বিধান মনে করে প্রসন্ন থাকা উচিত। এই কথা কেবল অনিচ্ছা ও পরের ইচ্ছায় লাভ করা সুখ-দুঃখাদি ভোগেই সীমাবদ্ধ, নতুন কর্মসম্বন্ধে নয়। নতুন কর্ম তো ভগবানের আশ্রয় নিয়ে নিজ সাত্ত্বিক বুদ্ধির দ্বারা তাঁর আদেশ অনুসারে সুচারুরূপে সম্পন্ন করুন। সকল কর্মেই এই ভাব থাকা প্রয়োজন।

অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যার রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক যতটা ক্ষীণ হয়েছে সে আধ্যাত্মিক পথে ততটাই অগ্রসর হয়েছে। বিকার অধিক থাকলে অধঃপতনও তদনুরূপ হয়। বিকার দুই প্রকারের হয়ে থাকে— (১) মুক্তি প্রদায়ক আর (২) পতনকারক। মুক্তি প্রদায়ক বিকার হল অন্যের দুঃখ দেখে দুঃখী হওয়া আর অপরের সুখে সুখী হওয়া। এটি বিকার হলেও যেহেতু মুক্তিপ্রদায়ক তাই তা গ্রহণযোগ্য হয়। যে বিকার পতন সুনিশ্চিত করে—তা হল নিজ দুঃখে দুঃখী আর নিজ সুখে অর্থাৎ সুখ প্রদায়ক বস্তু প্রাপ্তিতে হর্ষিত হওয়া। এই বিকার ত্যাজ্য। কিন্তু যে বিকার এই দুই থেকেও বড় বিকার তা অতিশয় লজ্জাজনক তা হল অপরের দুঃখে সুখী হওয়া, প্রফুল্ল হওয়া আর

অপরকে সুখী দেখে, উন্নত দেখে ঈর্ষা অনুভব করা। এটি তো অতিশয় সংকীর্ণতার লক্ষণ। এটি হল আসুরিক স্বভাব। আর এর থেকে বড় অপরাধ হল, যে উপকার করে তারও অপকার করা। এইরূপ সংকীর্ণমনা ব্যক্তির জন্য শাস্ত্রে কোনো শব্দই নেই—**'তে কে ন জানীমহে'**।

সর্বোত্তম কী ? যে অপকার করে তারও উপকার করা।

'জো তোকোঁ কাঁটা বুবৈ, তাহি বোউ তূ ফূল।'

এতেই নিজের কল্যাণ সুনিশ্চিত হয়। **'তোহি ফূলকো ফূল হৈ বাকো হৈ তিরসূল'**—এই উত্তরার্ধ ভাবকে আমাদের গ্রহণ করবার প্রয়োজন নেই। **'বাকো হৈ তিরসূল'**—এই কথা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি শুনতে চান না। যদিও নিয়ম তাই বলে, কিন্তু ক্ষমাযুক্ত ব্যক্তি এই নিয়মের দিকে দৃষ্টিপাত করতে চান না। তাঁদের তো ক্ষমা করাই স্বভাব হয়ে থাকে। তাঁরা তো স্বভাবেই সর্বভূতে বিদ্বেষ বিরহিত হয়ে সকলের বন্ধু হয়ে যান। তাঁদের অন্তরে সকলের প্রতি করুণাভাব থাকে। সাধু ব্যক্তি যদি শোনেন যে তাঁর অপকারকারী দণ্ড পাবে, তাহলে তিনি খুবই কষ্ট পান, তাঁর অশ্রুপাত হতে থাকে।

এক মহানুভব ব্যক্তি নৌকায় বসে পারাপার হচ্ছিলেন। সেই নৌকাতেই দুইজন অত্যাচারী দুষ্টও বসেছিল। অহেতুক অপরকে কষ্ট দেওয়া তো দুষ্টের স্বভাবই হয়ে থাকে। সেই মহানুভব ব্যক্তির সৌম্য, ঋজু ও শান্ত আকৃতি তাদের ক্লেশ প্রদান করতে লাগল। দুষ্ট দুইজন সংকেত করে সেই মহানুভব ব্যক্তিকে নদীতে ফেলে দেওয়ার পরিকল্পনা করল। তারা আস্তে আস্তে করে তাঁকে নৌকা থেকে ঠেলে জলে ফেলে দিতে উদ্যত হল। সেই সময়েই দৈববাণী হল—'এই দুইজন অতিশয় দুষ্ট, অত্যাচারী ও আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে। এরা আপনাকে নদীতে ডুবিয়ে মেরে ফেলতে চায়। আপনি অনুমতি দিলে এদেরই নদীতে ডুবিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করি।' দৈববার্তা শ্রবণ করে মহানুভব ব্যক্তি ক্রন্দন করতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন—'আমি কী অপরাধী—যার জন্য এদের ডুবিয়ে মেরে ফেলবার কথা শুনছি।' মহানুভবের করুণায় পরিপূর্ণ কথাগুলি শ্রবণ করে আবার দৈববার্তা হল—দণ্ড

না দিয়ে কী করলে ভালো হয় ? তখন তিনি বললেন—'এঁরা আমার দর্শন করেছেন, স্পর্শ করেছেন আর আমার সঙ্গ লাভ করেছেন। আমি যদি ঈশ্বরের কৃপাধন্য হই আর সাধু বলে পরিচিত হই তাহলে সাধুসঙ্গ লাভে যেন এঁদেরও সেই লাভ হয় আর এঁরাও প্রকৃত সাধুব্যক্তি হয়ে যান।'

সেই মহানুভব ব্যক্তির ও দৈববাণীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করে দুষ্ট ব্যক্তিদের উপর খুবই অতিশয় প্রভাব পড়ল। তারা মহানুভব ব্যক্তির চরণযুগলে লুটিয়ে পড়ল আর তখন থেকেই সাধু ব্যক্তিতে পরিণত হল।

এই হল উচ্চ শ্রেণীর ব্যবহার। এতে দয়া, ক্ষমা, অহিংসা ও অক্রোধ সবই পূর্ণরূপে বিদ্যমান। এই সকলই উচ্চভাবসম্পন্ন। দৈববাণী শ্রবণ করে মহানুভব ব্যক্তি ক্রন্দন মুখর হয়েছিলেন তা অবশ্যই বিকার ছিল কিন্তু সেই বিকার অপরের হিতাকাঙ্ক্ষায় ছিল তাই তা মুক্তিপ্রদায়ক হয়। এই হল মহাপুরুষদের সিদ্ধান্ত, তাঁদের অন্তরের ব্যঞ্জনা। এই আচরণকে যে কেউ বাস্তবে পরিণত করতে পারে। সকলের যাতে কল্যাণ হয়—এই মনোভাব যেন সর্বদা থাকে। এইটুকু হলেই হবে। একেই বলা হয় কর্মযোগ। কর্মযোগ তাহলে কী ? যে কার্যে স্বার্থ থাকবে না, কোনো ফলাকাঙ্ক্ষা থাকবে না আর যা অপরের কল্যাণে নিবেদিত থাকবে তাই তো কর্মযোগ। এই কর্মযোগের স্বল্প পালনেই কল্যাণ সুনিশ্চিত। ঈশ্বর নিজ মুখে বলেছেন—

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥

(গীতা ২।৪০)

'নিষ্কাম কর্মযোগে আরম্ভের বিফলতা হয় না অর্থাৎ বীজের বিনাশ হয় না আর বিপরীত ফলরূপ দোষও হয় না। উপরন্তু এই নিষ্কাম কর্মযোগরূপ ধর্মের অল্প সাধনাও জন্ম-মৃত্যুরূপ মহাভয় থেকে রক্ষা করে।'

অতএব এর অন্তর্নিহিত ভাব এই যে সামান্য কর্মও নিঃস্বার্থভাবে সম্পাদন করলে তা মুক্তি প্রদায়ক হয়ে থাকে। এবং যাঁর সম্পূর্ণ কর্ম নিঃস্বার্থভাবে সতত সম্পাদিত হয় তিনি তো মুক্তিস্বরূপ হয়ে থাকেন। তাঁর

দর্শন, স্পর্শ ও বাণীতে অন্যরা পবিত্র হয়ে যায়—মুক্ত হয়ে যায়। তাই স্বেচ্ছায় যা কিছু কর্ম করা হয় তা যেন সাবধানে করা হয়, স্বার্থত্যাগ করে করা হয় আর অপরের কল্যাণের জন্য যেন করা হয়। সেই কর্মই করা উচিত যাতে ঈশ্বর প্রসন্ন হন ; আর সতত তা প্রসন্নচিত্তে এই মনে করা যে, ঈশ্বরের বরদ হস্ত মস্তকের উপর সতত ধরা আছে। এই পথই উৎকৃষ্ট পথ। নিজ বুদ্ধি অনুসারে সেই কার্য সম্পাদনই যেন হতে থাকে যাতে ঈশ্বর প্রসন্ন হন। স্বেচ্ছায় তো ভগবানের প্রসন্নতা অনুসারে ও তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে কার্য সম্পাদন করা আর অনিচ্ছা ও অপরের ইচ্ছায় সম্পাদিত কর্মকে ঈশ্বরের প্রেরিত মঙ্গলময় বিধান মনে করা। অপরের ইচ্ছায় সম্পাদিত কর্মের বিষয়ে এই চিন্তা ধারণ করা ভালো যে ঈশ্বরই এমন করিয়েছেন আর অনিচ্ছায় সম্পাদিত কর্ম সম্বন্ধে ঈশ্বর স্বয়ংই তা করিয়েছেন—এরূপ মনে করা সর্বোত্তম। এইরূপ মনে করে সর্বদা প্রসন্নচিত্ত থাকা উচিত। একেই বলা হয় ভক্তি, শরণাগতি ও কর্মযোগ।

যে কার্যে ভগবানের সম্মতি আছে তাই করা আর তা কেবল তাঁর জন্যই সম্পন্ন করা। সব কিছু ঈশ্বরের মনে করে তাঁকে অর্পণ করা আর সকল কার্য সম্পাদনকালে তাঁকে মনে রাখা প্রয়োজন। ঈশ্বর প্রদত্ত প্রতিটি পরিস্থিতিতে কর্ম সম্পাদনকালে তাঁকে স্মরণ করে ও সন্তোষ অনুভব করে প্রসন্ন থাকা উচিত। প্রশ্ন উঠতে পারে যে কী ভেবে প্রসন্ন থাকব ? প্রসন্ন থাকা সম্ভব ভগবানের দয়ার কথা মনে করে, যেমন দেখ ! ভগবানের কী অসীম কৃপা ! অসীম কৃপার কথা মনে করে এত আনন্দ হওয়া দরকার যেন তা যেন চিত্তে উথলে পড়ে ! সতত আনন্দে মুগ্ধ থাকা। প্রয়োজনে বারে বারে প্রসন্নচিত্ত হওয়া। আহা ! প্রভু কত দয়াময়। এটি সর্বোৎকৃষ্ট সাধনা আর এইটাই ভক্তি আর এরই নাম শরণাগত হওয়া। ঈশ্বরের কৃপা, রুচি এবং তার স্বরূপ স্মরণ করে প্রসন্ন চিত্ত থাকা দরকার। সুখ-দুঃখ যাই আসুক, তাতেই তাঁর কৃপা দর্শন করা। নিজে যা করবেন তাতে লক্ষ্য রাখতে হয় যে এই কার্যে ঈশ্বরের অনুমোদন রয়েছে তো ? ঈশ্বরের দয়া ও অভিরুচির প্রতি লক্ষ্য থাকলে তাঁর

স্বরূপের স্মৃতি স্বতই অন্তরে বজায় থাকবে। যখন আপনি এই মনে করবেন —'অমুক মহাপুরুষ আমার উপর কত কৃপা করেছেন তখন স্বতই তাঁর স্মৃতি হবে আর যখন আপনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কাজ করবেন তখনও তাঁর স্মৃতি সতত বর্তমান থাকবেই। তদনুরূপভাবে ভগবানের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য।

অতএব ভগবানের প্রসন্নতা লাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ ভগবানের দয়ার উপর নির্ভর করে থাকবেন আর তা প্রত্যক্ষ করে উত্তরোত্তর প্রসন্ন হবেন। তাঁর প্রীতির জন্যই কার্য সম্পাদন করে যাওয়া উচিত এবং সতত তাঁকে স্মরণে রাখা উচিত।

———o———
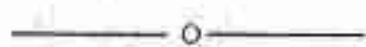
সত্যের আশ্রয়ে মুক্তি

'সৎ'—এই শব্দটি অতিশয় ব্যাপক। বস্তুত 'সৎ' শব্দের উপর বিচার করলে মনে হয় যে তা পরমাত্মারই স্বরূপ—তাঁরই নাম। যিনি সৎ তত্ত্ব অবগত তিনি ঈশ্বরকেও জানেন। যা সৎ তাই নিত্য—অমৃত। এই তত্ত্বের জ্ঞাতা মৃত্যুকে পরাজিত করেন। শোক এবং মোহকে লঙ্ঘন করে নির্ভয়ে নিত্য পরমধামে উপনীত হন। তিনি চিরকালের জন্য অভয় অমৃত-পদ লাভ করেন। তাঁকেই জগতে জীবন্মুক্ত, জ্ঞানী, মহাত্মা প্রভৃতি নামে উল্লেখ করা হয়। তাঁর সর্ব জীবে সমবুদ্ধি হয়ে যায় কারণ সৎ-রূপ ঈশ্বর সকলের মধ্যে সমানভাবে অবস্থিত এবং তিনি সৎ-এ অবস্থান করেন তাই তাঁর মধ্যে বৈষম্য থাকতেই পারে না। তিনি কখনো অসত্য ভাষণ করেন না। তাঁর কায়মনোবাক্যে সম্পাদিত কর্মসকল সত্য হয়। তাঁর কোনো কর্ম অসত্য না হওয়ায় তাঁর দ্বারা কৃত সকল আচরণ সত্য মনে করা হয়। তিনি যেরূপ আচরণ করেন অথবা বাণী দ্বারা নির্দেশ করেন তা আদর্শ রূপে গণ্য করা হয়—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥

(গীতা ৩।২১)

এমন ব্যক্তির অন্তঃকরণ, দেহ এবং ইন্দ্রিয়সকল—সবই সত্যে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তাঁর আহার-ব্যবহার এবং ক্রিয়াতে সত্য সাক্ষাৎ মূর্তিমান হয়ে বিরাজমান থাকে। জগতে এমন নররত্নের জন্মই ধন্য হয়। অতএব আমাদের এটি ঠিক ভাবে বুঝে সত্যের শরণাগত হওয়া উচিত অর্থাৎ সত্যকে জীবনে সুদৃঢ় ভাবে ধারণ করা উচিত।

সত্যের স্বরূপ

সত্য তাকেই বলা হয় যার কোনো কালে অভাব না হয়। তা সতত একরকম, সমভাবে সর্বস্থানে অবস্থিত আর যা নিজেই প্রমাণস্বরূপ।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ। (গীতা ২।১৬)

এমন 'সৎ' হলেন একমাত্র বিজ্ঞান আনন্দঘন চৈতন্যময় পরমাত্মাদেবই, শ্রুতি অনুসারে—**সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।** (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২।১)

জীবাত্মাও 'সৎ'। পরমেশ্বরের অংশ হওয়ায় তাকেও সনাতন নিত্য বলা হয়—**মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।** (গীতা ১৫।৭)

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৭ থেকে ২১ এবং ২৩ থেকে ২৫ শ্লোকে এই বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অতএব সেই সনাতন, অব্যক্ত, সত্যরূপ পরমাত্মার শরণাগত হলে জীব মায়া লঙ্ঘন করে সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করে। বিজ্ঞান-আনন্দঘন পরমাত্মা সৎ, তাই তার নামও সৎ। কারণ রূপ অনুসারেই নাম হয় এই কথাই জগতে প্রসিদ্ধ—

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। (গীতা ১৭।২৩)

'ওঁ, তৎ, সৎ—এই তিনটি ব্রহ্মের নাম বলা হয়েছে।' 'সৎ' শব্দটি অস্তিত্ব বা সত্তার বাচক। জগতে যা কিছুই প্রমাণিত হয় তা 'সৎ'-এর আধারেই হয়ে থাকে। অতএব সম্পূর্ণ জগতের আধার হল সৎ। সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, পৃথিবী আদি সব সত্যতেই প্রতিষ্ঠিত। সত্যের প্রতিষ্ঠায় সূর্য উত্তপ্ত হয়, বায়ু প্রবাহিত হয়। সৎ ছাড়া কোনো বস্তুরই সিদ্ধি হয় না। সৎ পরমাত্মার স্বরূপ এবং পরমাত্মাই হলেন সব থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ তাই শ্রেষ্ঠ গুণ উত্তম কর্ম এবং সাধুভাবে 'সৎ' শব্দের প্রয়োগ হয় অর্থাৎ যা কিছু শ্রেষ্ঠ গুণ, উত্তম কর্ম ও সাধুভাব তা সদ্‌গুণ, সদ্ভাব ও সৎকর্ম নামে শাস্ত্রে বিখ্যাত।

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎপ্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥

(গীতা ১৭।২৬)

উত্তম কর্ম হওয়ায় যজ্ঞ, দান, তপস্যাও সৎ কর্ম নামে প্রসিদ্ধ এবং এতে যে নিষ্ঠা ও স্থিতি, তাকেও 'সৎ' বলা হয়। স্বার্থ ত্যাগ করে সৎ স্বরূপ পরমাত্মার জন্য সম্পাদিত প্রতিটি কর্ম লোক এবং শাস্ত্রে 'সৎ' কর্ম নামে প্রসিদ্ধ।

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে॥

(গীতা ১৭।২৭)

বিচার করে দেখলে এই কথা যুক্তিযুক্ত মনে হয় যে সত্যের জন্য যা কিছু করা হয় তা সৎ বলে স্বীকৃত হয়। তাই সৎ নিমিত্ত কায়িক, মানসিক ও বাচিক সম্পূর্ণ ক্রিয়াসকল সত্যই হয় অর্থাৎ এই সকল ক্রিয়া জগতে সৎ বলে প্রমাণিত হয়।

সত্য কথা বলা

কপট, শব্দ চাতুরি এবং কূটনীতি ব্যতিরেকে হিংসাভাব না রেখে সরল ভাবে যেমন দেখা, শোন ও বোঝা যায় তেমনই কম করে অথবা বাড়িয়ে নয়—যথাযথভাবে বলাকে সত্য কথা বলা হয়। সত্য ভাষণে আগ্রহী ব্যক্তিদের এই সকল কথার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত—

১) নিজে কখনো মিথ্যা বলবে না এবং অন্যকে মিথ্যা বলতে প্রেরণা দেবে না। অন্যকে প্রেরণা দিয়ে বা তার উপর চাপ সৃষ্টি করে যে মিথ্যা ভাষণ করায় সে স্বয়ং মিথ্যাভাষণ করার অপেক্ষাও গুরুতর মিথ্যা ভাষণের অপরাধে দোষী হয়, কারণ তাতে মিথ্যার প্রচারে সাহায্য করা হয়। কোনো মিথ্যাভাষীর সঙ্গে একমতও হওয়া উচিত নয়। এমতাবস্থায় মৌন ধারণ করাও একদিক থেকে অসত্যকে সমর্থন করা হয়। মূল কথা হল কৃত, প্রেরিত ও অনুমোদিত—এতেও কোনো রকম মিথ্যার আশ্রয় চলবে না।

২) যতদূর সম্ভব কারো নিন্দা-স্তুতি করা ঠিক নয়। নিন্দা-স্তুতিকারী ব্যক্তি স্বার্থ, কামনা, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয় এবং উদ্বেগ আদির বশীভূত হয়ে অতি উৎসাহে কম বা বেশি নিন্দা-স্তুতি করতে শুরু করে। এতে নিন্দা করা তো সর্বতোভাবেই অনুচিত। বিশেষ যোগ্যতা লাভ হলে যদি কোথাও স্তুতি করতে হয় তাও অতি সাবধানে করা উচিত।

যে বেশি স্তুতির যোগ্য তার কম স্তুতি হয়ে গেলে সেই স্তুতি তার পক্ষে নিন্দার সমান হয়ে যায়।

যে কম স্তুতির যোগ্য তার বেশি স্তুতি করা হলে ভুল বার্তা ছড়িয়ে

লাভের বদলে ক্ষতিই হয়। এইরূপ মিথ্যা স্তুতিতে নিজের এবং যার স্তুতি করা হচ্ছে তার লাভের জায়গায় ক্ষতিই হয়। কিন্তু কোনো সত্য নির্ণয় করবার জন্য কমিটি অথবা আদালতে যখন যথার্থ কথা বলা হয় তখন তাকে নিন্দা বা স্তুতি ধরা হয় না। তাতে যদি নিন্দা বা স্তুতিযুক্ত বাক্য বলতে হয় তা বস্তুত বক্তার উদ্দেশ্য শুদ্ধ হওয়ায় সেটিকে নিন্দাস্তুতি ধরা উচিত নয়।

কোনো ব্যক্তি যদি নিজের দোষ জানবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে তবে তাকে প্রীতিপূর্বক শান্তভাবে যথার্থ দোষ বলে দেওয়াও নিন্দা নয়।

৩) যথাসাধ্য ভবিষ্যতের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা উচিত নয়। কেননা সবসময় সেটির পালন করা সম্ভব নাও হতে পারে। অতএব পদে পদে সেটি মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন বলে দেওয়া হল 'আমি কাল অবশ্যই আপনার সঙ্গে দেখা করব', কিন্তু তারপর যদি কোনো কারণে সেইখানে যাওয়া সম্ভব না হয় তাহলে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। অতএব এসব ক্ষেত্রে বলা উচিত—আপনার গৃহে কাল আমার যাওয়ার পরিকল্পনা আছে।

৪) কোনো ব্যক্তিকে শাপ বা বর দেওয়া উচিত নয়। তাতে তপস্যার ক্ষতি হয়। শাপ দিলে সেই পাপের ভাগী হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। এরূপ বদ্ অভ্যাসে স্বভাব খারাপ হয়, সত্য-ভ্রষ্ট হতে হয় ও আত্মার পতন হয়।

৫) কারো সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করা ঠিক নয়। তাতে প্রায় পরিহাস বুদ্ধিতে অসত্য কথা ব্যবহৃত হয়। যাকে আমরা উপহাস করছি সেই বাক্য তার মনের প্রতিকূল হলে তার চিত্তে আঘাত হানতে পারে যাতে হিংসাদি দোষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৬) ব্যঙ্গ ও কটাক্ষ করে কথা বলা উচিত নয়। তাতে মিথ্যা, কপট ও হিংসাদি দোষ ঘটতে পারে।

৭) শব্দ চাতুরির ভাষা ব্যবহার করা ঠিক নয়, যেমন শব্দে কোনো কথা সত্য কিন্তু তার অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় হল বিপরীত। যেমন রাজা যুধিষ্ঠির নিজ

গুরুপুত্র অশ্বত্থামার মৃত্যু সম্বন্ধে হাতির সাহায্য নিয়ে শব্দ চাতুরি প্রয়োগ করেছিলেন। তা মিথ্যা বলেই বিবেচিত হয়েছিল।

৮) মিতভাষণ অর্থাৎ শুদ্ধ বিচার-বিবেচনা করে যথাসাধ্য কম কথা বলা উচিত কারণ বেশি শব্দের ব্যবহার করলে চিন্তাভাবনা করে বলার সময় না থাকায় ভুলেও অসত্য কথা বলা হয়ে যেতে পারে।

সত্য পালনকারী ব্যক্তির কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, দ্বেষ, ঈর্ষা এবং স্নেহাদি দোষ থেকে দূরে থেকে সত্য পালনের চেষ্টা করা উচিত। যখন বাণীতে সত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে তখন ওই সকল দোষ সতত নষ্ট হয়ে যায়। এর মধ্যে যে কোনো একটির জন্যও যখন মানুষ সত্য হতে বিচলিত হয়ে পড়ে তাহলে একাধিক দোষের বশীভূত হয়ে অসত্য কথা বলায় আশ্চর্য কোথায় ?

সত্যবাদী ব্যক্তি হিংসা ও কপট থেকে সাবধান থাকবে। যে সত্য ভাষণে কারো হিংসা হয় তা বস্তুত সত্য ভাষণ নয়। এই প্রসঙ্গে মহাভারতের কর্ণ পর্বের ৬৯ অধ্যায়ে কৌশিক ব্রাহ্মণের কথা বলা আছে। এমন অবস্থায় সত্য পালন সম্ভব না হলে মৌন থাকা অথবা প্রকাশ না করাই হল সত্য। অবশ্য যদি অন্যের প্রাণরক্ষার জন্য মিথ্যা বলতে হয় তবে তা সত্য না হলেও পাপ বলে বিবেচিত হয় না।

যে সত্যে ছলচাতুরি থাকে সেই সত্য, সত্য নয়। সত্যভাষী ব্যক্তি জেনে শুনে সত্যের যতটা অংশ শব্দে ও ভাবে লুকোয় সে অংশে সে চুরি করে। হিংসা ও ছলচাতুরী—এই দুইই সত্যে কলঙ্কলেপন করে। তাই যে সত্যে হিংসা ও ছলচাতুরীর অল্প অংশও থাকে তা সত্য শব্দ হলেও মিথ্যা মনে করা হয়ে থাকে।

পামর-বিষয়ী ব্যক্তিগণ অকারণেই প্রমাদবশত মিথ্যা বলে থাকে কারণ তারা সত্য কথার রহস্য ও মহত্ত্ব থেকে সর্বতোভাবে অনভিজ্ঞ হয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের পতন হয়। কিন্তু যে বিচারযুক্ত ব্যক্তি, সে সত্যকে উত্তম মনে করে তা পালন করতে ইচ্ছুক হয়, কিন্তু তার পক্ষেও সতত সত্য পালন করা কঠিন হয়ে থাকে। অনন্ত জন্ম ধরে মিথ্যা বলবার অভ্যাসের ফলে

তার পক্ষে সত্যের সিদ্ধি দুষ্কর হয়। কিন্তু বিবেকবুদ্ধি দ্বারা, স্বার্থ ছেড়ে যে সত্য পালনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করে তার পক্ষে সত্যের পালন হওয়া—তার প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব—অসাধ্য নয়। যে এইভাবে সত্যে সর্বাঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয় তার কথা সত্য হয়ে যায় অর্থাৎ সে যা কিছু বলে তা সত্য হয়। মহর্ষি পতঞ্জলিও যোগপাদ ২ সূত্র ৩৬এ বলেছেন—

'সত্য প্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্'

অগস্ত্যের কথায় নহুষের পতন হয়ে যাওয়া আদি অনেক উপাখ্যান শাস্ত্রে আছে।

সত্যবাদী ব্যক্তি নির্ভয় হয়, কারণ যতক্ষণ ভয় থাকে যতক্ষণ যথার্থভাষী হওয়া সম্ভব নয়—ভয়ের কারণে মিথ্যা কথা বলা হয়ে যায়। যে সর্বতোভাবে সত্যবাদী সে ক্ষমাশীল হয়, ক্রোধের বশীভূত হয় না। ক্রোধী ব্যক্তি সত্যপালনে সতত অসমর্থ হয়। ক্রোধোন্মাদে অনেক কিছুই বলে বসে।

সত্যপালনে মানুষ অভিমান বিরহিত হয়। মান ও প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা যেখানে থাকে সেখানে দম্ভ ও কপটের আশ্রয় থাকে, সে স্থলে সত্য তখনই অন্তর্নিহিত হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে কপট ও দম্ভের ফলে সত্য হতে পতন অনিবার্য হয়।

যখন সর্বতোভাবে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়ে যায় তখন সেই সত্যবাদীর মধ্যে কোনো রকমের ইচ্ছা বা কামনা থাকে না। ভোগেচ্ছু ব্যক্তি কী অনর্থ না করে ? কারণ কামই পাপের মূল। তাই কামের বশীভূত হয়ে কামী ব্যক্তি মিথ্যা, কপট, ছলচাতুরী আদি দোষের খনি হয়ে যায়। অতএব সত্যের সম্যক্ পালনে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা ও অহংকার আদি দোষ বিনাশ হয় আর সেই ব্যক্তি এক সত্য পালনের প্রভাবেই দয়া, শান্তি, ক্ষমা, সমতা, নির্ভয়তা আদি সম্পূর্ণ গুণের ভাণ্ডার হয়ে যায়। তাই মানুষের সত্য ভাষণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবার বিশেষভাবে চেষ্টা করা উচিত।

সত্য আহার

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—সকলেই শাস্ত্রকথিত বিধি অনুসারে নিজ

পরিশ্রম দ্বারা ন্যায়পথে উপার্জিত দ্রব্যে যে সাত্ত্বিক আহার[১] করে তার নাম সত্য আহার। যদিও ব্রাহ্মণের জন্য দান গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করা শাস্ত্রানুকূল তবুও দাতার উপকার না করে যে যাচনাবৃত্তিকে নিজ ধর্ম মনে করে জীবন ধারণ করে সেই ব্রাহ্মণ নিন্দাযোগ্য হয়। তাতে তপস্যার ক্ষয়, আলস্য ও অকর্মণ্যতার বৃদ্ধি হয়। তাই শাস্ত্রোক্ত হলেও এইভাবে জীবিকার জন্য গৃহীত অন্নকে সত্য আহার বলা যায় না। অতএব দাতার প্রতি উপকার করে অথবা শিলোঞ্ছ বৃত্তি দ্বারা ব্রাহ্মণের জীবিকা-নির্বাহ করা উচিত। এইভাবে ক্ষত্রিয়ও স্বধর্ম অনুসারে সত্য ও ন্যায়পথে উপার্জন করা শুদ্ধ দ্রব্য দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করবে।

যদিও বৈশ্যের জন্য সুদ নিয়ে জীবিকা নির্বাহ ধর্মশাস্ত্রানুকূল, তবুও শাস্ত্রকারগণ ক্রয়-বিক্রয়-বাণিজ্য ছাড়া শুধুমাত্র সুদ বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারীর নিন্দা করে থাকেন। তাই ভগবান গীতায় তা উল্লেখ করেননি। তাতে আলস্য ও নিরুদ্যমতা বৃদ্ধি হয়। অলংকার ও জমি বন্ধক রেখে পাওয়া অর্থ থেকে সুদের পরিমাণ যখন বেশি হয়ে যায় তখন দেনাদার তা ছাড়িয়ে নিতে পারে না, ফলে সে মনে খুবই দুঃখ পায়। তাই কেবল সুদের কারবারকে নিন্দনীয় বলা হয়। এই জীবিকার দ্বারা বৈশ্য যে আহার করে সেই আহারও সত্য-অর্জিত নয়। এইভাবে ক্ষত্রিয় আদির জন্যও বুঝে নেওয়া উচিত।

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিহিত নিজ বর্ণাশ্রম অনুকূল পরিশ্রম করে ন্যায় পথে সাত্ত্বিক দ্রব্য আহার করে সেই আহার সত্য-অর্জিত আহার হয়। যেমন কোনো বৈশ্য যদি মিথ্যা ও কপট ত্যাগ করে ঈশ্বরের আদেশে নিজ ধর্ম মনে করে ক্রয়-বিক্রয় আদি ন্যায়সম্মত জীবিকা দ্বারা লাভ করা সাত্ত্বিক বস্তুর

---

[১]আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ ।

রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥ (গীতা ১৭।৮)

যে সকল আহার, আয়ু, সত্ত্বগুণ, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রসন্নতা বৃদ্ধিকারী, রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, যার সারভাগে শরীর দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং যা হৃদয়ের শক্তি জোগায়—এরূপ আহার সাত্ত্বিক ব্যক্তির প্রিয়।

সেবন করে তাহলে তার আহার সত্য-অর্জিত আহার। ব্যবসায়ে যুক্ত বৈশ্যের উচিত যে যথাসাধ্য কম দামে কম লাভে মাল বিক্রি করে ; গুনতিতে, ওজনে, মাপে কম বা বেশি না করা। সুদ, লাভ, আড়ত ও দালালি দেখিয়ে কাউকে কম দেওয়া, বেশি নেওয়া উচিত নয়। আদান-প্রদান চতুর ও বিচক্ষণ ব্যক্তির সঙ্গে যেমনভাবে করা হয় তেমনভাবেই মূর্খ, কম বুদ্ধিমান ও সাধারণ ব্যক্তির সঙ্গে করা অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষে তার ব্যবহার যেন ভিন্ন না হয়। যে অর্থাদি আছে সেগুলিকে ঈশ্বরের মনে করে লাভ-লোকসানে সমত্ব-ভাব রেখে দক্ষতা সহকারে ব্যবসা করা এবং এই চেষ্টা করা যাতে মূলধন নাশ না হয় ; যতদূর সম্ভব কারো জীবিকার ক্ষতি না হয়, হিংসা দূরে রেখে ন্যায় পথে ধন উপার্জন করা আর সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করা ; যত কম খরচে নিজের ও আত্মীয়র নির্বাহ হয় তাই চেষ্টা করা ; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সম্পদকেও নিজ স্বত্বঃ না মনে করে সংসারের হিত চিন্তা করে অপরের উপকারের জন্য ব্যয় করা — তাই সত্য ব্যবসা। এই ভাবে ব্যবসা দ্বারা উপার্জিত দ্রব্যে যে সাত্ত্বিক অন্নাদি আহার হয় তা বৈশ্যের জন্য সত্য আহার। এইভাবেই অন্য সব ক্ষেত্রে বুঝে নিতে হবে।

সৎভাব ও সদ্‌ব্যবহার

উপরে উদ্ধৃত 'সৎ' হল পরমেশ্বরের নাম। তাঁকে লাভ করার 'ভাব' ও ব্যবহারকে বলা হয় 'সৎভাব' এবং 'সদ্‌ব্যবহার'। একে সাধুভাবও বলা হয়। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এটি 'জ্ঞান' এবং ষোড়শ অধ্যায়ে 'দৈবী-সম্পদ' নামে প্রসিদ্ধ। এর মধ্যের ভাববাচক শব্দগুলিকে সাধুভাব বলে জানতে হবে। যেসব ব্যক্তির মধ্যে উত্তম ভাব বিরাজ করে তাঁদের পরমাত্মা প্রাপ্তির উপযুক্ত বলে বুঝতে হবে, ঈশ্বর লাভের হেতু হওয়ায় এগুলিকে সদ্ভাব বলা হয়।

'অমানিত্ব' (মান আকাঙ্ক্ষা না করা), ক্ষমা (কারো অত্যাচারের প্রতিশোধ না নেওয়া), কোমলতা, সরলতা, পবিত্রতা, শান্তি, শীতলতা, সমতা, বৈরাগ্য, শ্রদ্ধা, দয়া, ঔদার্য, সৌহার্দ্য ইত্যাদি ভাব সাকার

পরমেশ্বরের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বিরাজ করে এবং তাঁর শরণাগত উপাসনাকারী ভক্তদের মধ্যে ঈশ্বরের দয়ায় বিকাশ লাভ করে। এরূপ সদ্ভাবযুক্ত ভক্তগণ পরমাত্মদর্শনের অধিকার লাভ করেন। অতএব আমাদেরও এইসব ভাবগুলি প্রাপ্ত করার জন্য সর্বপ্রকারে পরমেশ্বরের শরণাগত হওয়া উচিত। ভগবানের দয়াতে যে ব্যক্তির মধ্যে উপরিউক্ত সদ্ভাব আসে তাঁর আচরণও সত্য হয়ে ওঠে ; কারণ সদাচারের হেতুই হল সৎভাব। আন্তরিক ভাব যেমন থাকে, তেমনই থাকে বাহ্যিক চেষ্টা। সুতরাং সদ্ভাবের দ্বারা মুক্তি এবং অসদ্ভাবের দ্বারা পতন হয় বলে জানতে হবে। উপরিউক্ত সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সাধারণত সেইসব স্থানে যান না, যেখানে সম্মান, পূজা ইত্যাদি পাবার সম্ভাবনা থাকে। কোনো ব্যক্তি যদি এইসব সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তির কোনো ক্ষতি করে তাহলে তিনি মনে করেন 'আমি আমার পূর্বকৃত কোনো কর্মের ফল প্রাপ্ত হয়েছি ; এই ব্যক্তি নিমিত্ত মাত্র' এই ভেবে তিনি কারোকে দ্বেষ বা ঘৃণা করেন না ; উপরন্তু সুযোগ মতো তার মনের সঙ্কোচ, গ্লানি, ভয় ও দ্বেষ দূর করার চেষ্টা করে থাকেন।

যদি তাঁর সঙ্গে কোনো ব্যক্তি অসদ্‌ব্যবহার করে অথবা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে ও কঠোর বাক্য প্রয়োগ করে, তাসত্ত্বেও তিনি বিনয় ও সরলতাযুক্ত মধুর বাক্যে তাকে শান্তিপূর্বক উত্তর দেন, যেমন শ্রীরামচন্দ্র তাঁর জননী কৈকেয়ীকে বলেছিলেন—

সুনু জননী সোই সুতু বড়ভাগী। জো পিতু মাতু বচন অনুরাগী॥
তনয় মাতু পিতু তোষনিহারা। দুর্লভ জননি সকল সংসারা॥
মুনিগন মিলনু বিসেষি বন সবহিঁ ভাঁতি হিত মোর।
তেহি মহঁ পিতু আয়সু বহুরি সম্মত জননী তোর॥
ভরতু প্রানপ্রিয় পাবহিঁ রাজূ। বিধি সব বিধি মোহিঁ সনমুখ আজূ॥
জৌঁ ন জাউঁ বন ঐসেহু কাজা। প্রথম গনিঅ মোহি মূঢ় সমাজা॥

বাস্তবে এরূপ সদ্ভাবসম্পন্ন পুরুষ সমস্ত জগতেই তাঁর পরম প্রিয় প্রভু পরমাত্মার স্বরূপ দর্শন করে থাকেন এবং মনে মনে সকলকে প্রণাম জানিয়ে সকলের সঙ্গেই সদ্‌ব্যবহার করেন।

সীয় রামময় সব জগ জানী। করহুঁ প্রনাম জোরি জুগ পানী॥

এরূপ ব্যক্তিদের শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমভাব থাকে এবং প্রয়োজনে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও দুর্যোধনের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করেছিলেন, তেমনই ব্যবহার করে থাকেন। মহাভারতের যুদ্ধের প্রারম্ভে এঁরা দুজনেই যখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়েছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ তাদের বলেছিলেন— 'আমার কাছে তোমরা দুজনেই সমান। আমার যা আছে তা তোমরা দুজনে ইচ্ছা অনুযায়ী ভাগ করে নিতে পারো। একদিকে আমার এক অক্ষৌহিণী সৈন্যদল আছে এবং অপরদিকে আমি নিজে নিরস্ত্রভাবে রয়েছি। তোমাদের দুপক্ষের মধ্যে যে যুদ্ধ হবে, তাতে আমি কোনো অস্ত্র ধারণ করব না। সুতরাং এই দুইয়ের মধ্যে তোমরা যে যা খুশি বেছে নিতে পারো।' তখন দুর্যোধন এক অক্ষৌহিণী সৈন্যদল বেছে নিলেন এবং অর্জুন নিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে।

এরূপ ব্যক্তিদের অতি বড় বিষয় ভোগও বিচলিত করতে পারে না। যেমন যমরাজ প্রদত্ত প্রলোভন নচিকেতাকে বিচলিত করতে পারেনি। তিনি রথ, ঘোড়া এবং স্বর্গের নানাবিধ মনোরম ভোগও অনায়াসে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করে পরমাত্মধনই শ্রেষ্ঠ বলে তা আপন করে নিয়েছিলেন—

ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেত্ত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব॥
অজীর্যতামমৃতানামুপেত্য জীর্যন্মর্ত্যঃ ক্বধঃস্থঃ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন্বর্ণরতিপ্রমোদানতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত॥
যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো যৎসাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।
যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে॥

(কঠ. ১।১।২৭-২৯)

'মানুষ দ্রব্যাদির দ্বারা তৃপ্ত হয় না। অর্থাদি সম্পদ তো আপনার দর্শনেই লাভ হয়। আপনি যতদিন অনুগ্রহপূর্বক রক্ষা করবেন, ততদিন আমি জীবিত থাকতে পারব। কিন্তু সেই বর চাই যা আমি প্রার্থনা করি। জরারহিত অমৃতরূপ দেবতাদের কাছে গিয়ে জরা-মৃত্যুময় এই পৃথিবীরূপ অধোস্থানে

বসবাস করে কোন্ ব্যক্তি অনিত্য বস্তুর আশা করবে ? রূপ-রস-ক্রিয়া এবং তার থেকে উৎপন্ন হওয়া সুখ যে অনিত্য, তা জেনেও কোন্ ব্যক্তি দীর্ঘায়ু লাভ করে সন্তুষ্ট হবে ? হে মৃত্যুর দেবতা ! পরলোক সম্পর্কীয় আত্ম-তত্ত্বে যে আশঙ্কা করা হয়ে থাকে, সেই আত্মবিজ্ঞান সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। এই অতি গোপনীয় গূঢ় বর ব্যতীত নচিকেতা আর কিছুই প্রার্থনা করে না।'

এরূপ ব্যক্তিগণ বেদ, শাস্ত্র এবং মহাপুরুষদের বাক্য প্রত্যক্ষের ন্যায় বিশ্বাস করেন, যেমন কল্যাণকাঙ্ক্ষী সত্যকামের গুরু-বাক্যে অত্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ লাভের উদ্দেশ্যে উদ্দালকের সেবা করার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। গুরু তাঁকে তখনই নির্দেশ দিলেন যে 'এই চারশত গাভী নিয়ে বনে গমন করো, যখন এদের সংখ্যা এক সহস্র পূর্ণ হবে, তখন ফিরে আসবে।' (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৪।৪।৫)। বলা বাহুল্য যে সত্যকাম তাঁর দৃঢ় শ্রদ্ধা এবং গুরু প্রসাদে বনে বাস করার সময়ই আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করে কৃতকৃত্য হয়েছিলেন।

উত্তম ব্যক্তিগণ অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নির্দয় আচরণকারী ব্যক্তিদের সঙ্গেও উদারতা, দয়া এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করে থাকেন। এই বিষয়ে ভক্ত জয়দেব কবির চরিত্র অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ—

একবার ভক্ত শিরোমণি অযাচক জয়দেবকে কোনো এক রাজা বহু অনুনয় বিনয় সহকারে বহুমূল্য রত্ন প্রদান করেছিলেন। সেই বিপুল ধনরাশি নিয়ে যখন তিনি নিজগৃহে যাচ্ছিলেন, তখন পথে ডাকাত পড়ে। লোভের বশবর্তী হয়ে ডাকাতেরা ধনরত্ন ছিনিয়ে নিয়ে সেই নিঃস্পৃহ ভক্তের হাত কেটে নেয় ! এতেও ক্ষান্ত না হয়ে তারা নির্দয়ের মতো তাঁকে নিকটস্থ এক নির্জলা কুয়োর মধ্যে ফেলে আরও গভীর পাপ করে বসে। দৈবযোগে তৃষ্ণার্ত রাজা সেই কুয়োর কাছে আসেন। যেই তিনি জল তোলার জন্য কুয়োতে দড়ি ফেলেন, তখনই তিনি সেখান থেকে এক পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পান। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন কষ্টে পড়া ব্যক্তিটি জয়দেব ব্যতীত অন্য কেউ নন। রাজা তাঁকে বাইরে এনে দুঃখিত ভাবে জিজ্ঞাসা

করলেন, 'জয়দেব, এমনটি কী করে হল ? কোন্ নিষ্ঠুর ব্যক্তি তোমার সঙ্গে এরূপ দুর্ব্যবহার করে নিজের মৃত্যু ত্বরান্বিত করেছে ?' ভক্ত চুপ করে থাকলেন — বহুবার জিজ্ঞাসা করলেও কোনো উত্তর দিলেন না। রাজার কোনো কথাই তিনি শুনলেন না। অতঃপর রাজা জয়দেবকে তাঁর রাজমহলে নিয়ে গিয়ে দিবারাত্র তাঁর সেবায় মগ্ন হয়ে থাকলেন। ঘটনাচক্রে সেই ডাকাতদের মহলের দিকে আসতে দেখা গেল। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে জয়দেব বললেন— 'রাজন্ ! আপনি আমাকে অনেকবার ধন গ্রহণ করতে বলেছেন ! আজ আপনি ইচ্ছানুযায়ী আমার এই বন্ধুদের ধন দান করতে পারেন।' বলামাত্রই রাজা সেই ভয়চকিত ডাকাতদের কাছে ডাকলেন। অপরাধী সেই ডাকাতদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল, ভয়ে তাদের পা কাঁপতে লাগল। বহুক্ষণ পর আশা ও আশ্বাস পেয়ে তাদের কম্পিত হৃদয় শান্ত হল। তারা তখন সাহস করে মনে যা এল তাই প্রার্থনা করল। নিজেদের দুষ্কৃত কর্মের বিপরীত ফল পেয়ে তারা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত ও আনন্দিত হল ! পরে দ্বাররক্ষী সহকারে তাদের সাদর বিদায় জানানো হল। দ্বাররক্ষী এই অদ্ভুত রহস্য জানতে উৎসুক হয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করল —'আরে ভাই ! ভক্ত জয়দেবের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ হল কীকরে ? তিনি কোন্ কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে আপনাদের এতো ধনসম্পদ দেওয়ালেন ?'

ডাকাতগুলো ছলনাময় মৃদুহাসি নিয়ে বলল—'দ্বাররক্ষীভাই ! আমরা এই জয়দেবকে একবার মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছি—তাই তিনি সেই প্রাণদানের দাম দিলেন।' শেষ অক্ষরটি বলার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামনের জমি দুভাগ হয়ে গেল এবং সেই নরাধমেরা তাতে চিরকালের মতো বিলুপ্ত হয়ে গেল। দ্বাররক্ষী রাজদরবারে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাল। সেই কথা শুনে জয়দেবের চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে লাগল। চোখের জল দুহাত দিয়ে মুছতে থাকলে রাজা বিস্মিত হয়ে বারংবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় পরমভক্ত জয়দেব তখন সমস্ত ঘটনা জানালেন। রাজা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন— 'যারা আপনার হাত কেটে নিয়েছিল, তারা কী করে আপনার বন্ধু হল ?'

জয়দেব—আমি দান গ্রহণ না করার যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আপনার ঐকান্তিক আগ্রহে তা ভঙ্গ করতে হয়েছে। সেই প্রতিজ্ঞাভঙ্গের দণ্ডস্বরূপ আমার হাত কেটে তারা আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। এইরূপ ক্রিয়াত্মক শিক্ষার সাহায্যে যিনি আমার হিতসাধন করেছিলেন, তারা মিত্র ব্যতীত আর কী হতে পারেন ?

রাজা—আপনি এদের ধনসম্পদ প্রদান করালেন কেন ?

জয়দেব—ধনসম্পদের লোভ থাকলে তারা আবার কখনো সুযোগ পেয়ে কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে খুন করতে পারেন, এই চিন্তা করে এদের কামনাপূরণের উদ্দেশ্যে আমি আপনাকে ধন প্রদান করতে বলেছিলাম। বন্ধুত্বের জন্যও ধনপ্রদান করা ন্যায়সঙ্গত ছিল।

রাজা—এদের মৃত্যুতে আপনি শোক করছেন কেন ?

জয়দেব—আমার জন্যই এদের মৃত্যুবরণ করতে হল। আমাকে সবাই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সাহচর্যে শ্রেষ্ঠ ফলই পাওয়া উচিত, কিন্তু এর ফল হল তার বিপরীত। তাই আমি দুঃখপ্রকাশ করছি—'হে প্রভো ! আমি এমন কি অপরাধ করেছি যাতে এদের আমার সাহচর্যের দুঃখজনক পরিণাম ভোগ করতে হল ?'

রাজা—তাহলে আপনার হাত এল কী ভাবে ?

জয়দেব—এ হল ঈশ্বরের দয়া। তিনি তাঁর সেবকের অপরাধ বিচার না করে নিজের দয়াযুক্ত স্বভাব অনুযায়ী আচরণ করেন।

ভক্ত শিরোমণি জয়দেবের কথা শুনে রাজা পুলকিত হলেন—তিনি আনন্দে গদ্‌গদ হয়ে উঠলেন। একেই বলা হয় সত্যপালকের সদ্‌ভাব এবং তাঁর সহৃদয়তা !

সৎকর্ম

পরমপিতা পরমেশ্বর হলেন সৎ। তাই তাঁর জন্য করা কর্ম হল সৎকর্ম।

কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে। (গীতা ১৭।২৭)

সুতরাং মোক্ষ আকাঙ্ক্ষাকারী ব্যক্তিগণ যেসব কর্ম করেন সে সবই ভগবদর্থ হয়।

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥

(গীতা ১৭।২৫)

এইভাবে ঈশ্বরার্থ এবং ঈশ্বরার্পণ কর্ম দ্বারা মানুষ পাপ-পুণ্যরহিত হয়ে সৎ-স্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করে। ঈশ্বরার্থ এবং ঈশ্বরার্পণ এই দুই প্রকার কর্মই মুক্তি প্রদানকারী হয়ে থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নানাস্থানে অর্জুনকে এইরূপ কর্ম করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। দ্রষ্টব্য— গীতা অধ্যায় ৩।৯ ; ৯।২৭ ; ১২।১০-১১ ইত্যাদি।

সেইজন্যই যজ্ঞ, দান, তপস্যা, সেবা, পূজা অথবা জীবিকাদি সকল কর্মই ঈশ্বরার্থ করা কর্তব্য। সত্যকার সেবক যে, সে যেমন সমস্ত কার্যই প্রভুর নামে, তাঁর জন্য, তাঁর ইচ্ছানুযায়ী করে অথচ কোনো কাজে বা সম্পত্তিতে নিজের অধিকার আছে বলে মনে করে না এবং স্বপ্নেও অন্তরে কোনো বস্তুতে তার মমত্ববোধ না থাকায় তার ন্যায়যুক্ত প্রতিটি কর্ম হর্ষ-বিষাদ মুক্ত হয়। তেমনই ভগবদ্‌ভক্তদের উচিত যে তাঁরাও যেন নিজ অধিকারের সম্পত্তি-পরিবার-পরিজন ইত্যাদি সামগ্রী ঈশ্বরের বলে মনে করে তাঁর নির্দেশানুসারে সেই কার্যে ব্যাপৃত থাকার ন্যায়ত চেষ্টা করে এবং তাঁরা যে কোনো নতুন কর্ম বা ক্রিয়া করবেন তা যেন ঈশ্বরেরই প্রসন্নতা এবং নির্দেশানুযায়ী করেন, যেমন বাঁদর তার প্রভুর ইচ্ছায় কর্ম করে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে ঈশ্বরের ইচ্ছা আমরা জানব কেমন করে ? তাতে বলা যায় যে আপনি এই নিয়ে ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কেননা তিনি আপনার হৃদয়ে বিরাজমান—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।

(গীতা ১৫।১৫)

'আমার কী করা উচিত এবং কী করা অনুচিত'—আপনি যদি এই বিষয় নিজ হৃদয়স্থ পরমাত্মার কাছে জানতে চান, তাহলে সেই ন্যায়াধীশ প্রভু আপনার হৃদয়ে থেকে সৎ প্রেরণাই যোগাবেন। কোনো ব্যক্তি যখন

সদ্‌ভাবের দ্বারা অন্তরাত্মার নিকট থেকে পরামর্শ প্রার্থনা করেন তখন সেই পবিত্র আত্মা তাঁকে সৎপরামর্শই প্রদান করেন। সাধারণভাবে যখন কেউ তার আত্মাকে প্রশ্ন করে যে, 'চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাচার ইত্যাদি কর্ম কেমন ?' তখন উত্তর পাওয়া যায় 'এসবই ত্যাজ্য ও নিষিদ্ধ।' সেইরূপ ব্রহ্মচর্য, অহিংসা এবং সত্য ইত্যাদি বিষয়ে অনুমতি চাইলে উত্তর পাওয়া যায় 'এগুলি অবশ্য পালনীয়।' অজ্ঞানতা, রাগ-দ্বেষ এবং সংশয় ইত্যাদি দোষে হৃদয় আচ্ছাদিত থাকলে কোনো কোনো বিষয়ে নিশ্চিতভাবে উত্তর পাওয়া সম্ভব হয় না, সুতরাং এইসব ক্ষেত্রে তত্ত্বজ্ঞ কোনো মহাপুরুষের সন্ধান জানা থাকলে, তাঁর নির্দেশিত বিধানকে ঈশ্বরের নির্দেশ মনে করে সেইরূপ আচরণ করা কর্তব্য।

সৎস্বরূপে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করার ব্যবহারকে বলা হয় সদ্‌ব্যবহার। একে সদাচারও বলা হয়। কল্যাণাকাঙ্ক্ষী সাধকদের এটি পালন করার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট থাকা উচিত। যাঁদের ঈশ্বর-লাভ হয়েছে তাঁদের দ্বারা সত্য-আচরণ স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে।

জগতে কোনো জীবকে কখনো কোনো প্রকারে দুঃখ, ভয় এবং কষ্ট দেওয়া বা কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা ও চেষ্টা করা উচিত নয়। যদি কেউ কাউকে কষ্ট দিতে থাকে, তাহলে কষ্টপ্রদানকারীকে কোনো ভাবেই সাহায্য করা উচিত নয়, অনুমোদন করাও উচিত নয়। শুধু তাই নয়, এ নিয়ে যেন অন্তরে সামান্যতম প্রসন্নতাও না আসে।

অজ্ঞানতা এবং রাগ-দ্বেষ সদাচারকারীর পক্ষে অতিশয় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অতএব সাধকদের এগুলির থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়। ভ্রমবশত এবং মূর্খতার জন্য মানুষ নানাপ্রকার দুরাচারে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং সদাচার-সম্পন্ন ব্যক্তিদের সত্য ও অসত্য বিষয়ে শাস্ত্র এবং সাধুব্যক্তিদের সাহায্যে নিজ নিজ বুদ্ধির দ্বারা বিচার করে সত্য আচরণ করা কর্তব্য। অন্যথায় তারা সত্যকে অসত্য এবং দুরাচারকে সদাচারের রূপ প্রদান করে দুরাচরণে প্রবৃত্ত হবে, যার ফলে তাদের পরমার্থ স্বাভাবিকভাবে ভ্রষ্ট হয়ে যায়।

রাগ (আসক্তি)

সাধকদের সব থেকে বড় শত্রু হল রাগ বা আসক্তি। এটি কাম ও লোভরূপে পরিণতি লাভ করে এবং সমস্ত অনর্থের মূল হয়ে ওঠে। এর ফলেই সাধক বিষয়ের দাস হয়ে অর্থকামনায় জগতে ঘুরে মরে। নিজের আচরণশোধনকারী ব্যক্তিগণের পদে পদে এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয় যে 'আমি যেন স্বার্থের পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়ে আচার-ভ্রষ্ট না হয়ে যাই।' মানুষ যখন কোনো কাজ আরম্ভ করে তখন স্বাভাবিকভাবেই আসক্তির কারণে সেই কাজের সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে নিজের স্বার্থের খোঁজ করে এবং ভাবতে থাকে এই কাজটি করলে আমার কী লাভ হবে ? এইরূপ কামনা তাকে সমস্ত বিষয়ের দাস করে শ্রেয়মার্গ থেকে তৎক্ষণাৎ বিচ্যুত করে। সুতরাং কল্যাণাকাঙ্ক্ষী সাধকের উচিত কার্য আরম্ভ করার আগেই সাবধান হওয়া যাতে কোথাও স্বার্থের অনুপ্রবেশ না ঘটে। মনে স্বার্থ-চিন্তা প্রবেশ করলে সদাচার দুরাচাররূপে পরিণত হয়। সদাচার পালনকালে যদি ভ্রমবশত কিছু ভুল-ত্রুটি হয় বা কোনো অংশ পালন করা না হয়ে থাকে, তাহলে নিঃস্বার্থ-ব্যক্তিকে দোষী বলে মনে করা হয় না। স্বার্থ-জড়িত থাকলে তবেই দোষ হয়। স্বার্থ অত্যন্ত প্রবল, এর বিস্তার ও প্রসার এমনই যে এটি পদে পদে ব্যাপ্তিলাভ করে, তাই সাবধান হলেও মানুষ ভুল করে ফেলে। জগতের সমস্ত কর্ম ও পদার্থে স্বার্থবুদ্ধি ছেয়ে রয়েছে। অত্যন্ত বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিও এর কবলে পড়ে নিজ কর্তব্য বিস্মরণ হয়। স্বার্থ থেকে রক্ষা পেতে, তাকে সমূলে নাশ করার জন্য মানুষের সর্বদা সতর্কতার সঙ্গে চেষ্টা করা উচিত। যে ব্যক্তি এই স্বার্থকে জয় করে, সে সর্বপ্রকার কামনা ও স্পৃহা ত্যাগ করে পরম শান্তিতে বসবাস করে। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা তাদের আচরণও শোধরাতে পারে না এবং কখনো শান্তিও লাভ করে না।

দ্বেষ

রাগের ন্যায় দ্বেষও মানুষের পরম শত্রু। এর জন্যই মানুষ ক্রোধের বশীভূত হয়ে কর্তব্য ভুলে গিয়ে বিপরীত আচরণে লিপ্ত হয়, যার ফলে তার

সর্বনাশ হয়। স্মরণ রাখা উচিত যে দ্বেষের মূল কারণই হল রাগ বা আসক্তি। এই রাগ বা আসক্তি থেকেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি প্রবল শত্রুসমূহ উৎপন্ন হয়ে মানুষকে সদাচার থেকে ভ্রষ্ট করে তার বুদ্ধিনাশ করে দেয়, যার ফলে সে পরমার্থ থেকে পতিত হয়, তাই আসক্তি ত্যাগ করার ওপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত।

আসক্তি বর্জিত ব্যক্তির প্রতিটি ক্রিয়া নিঃস্বার্থভাবে হয়ে থাকে, তাই তাঁর প্রত্যেক আচার-ব্যবহারে ভালোবাসা ও দয়ার ভাব প্রস্ফুটিত হয়। কোনো বিষয়ে রাগ না থাকায়, জগতের সমস্ত ভোগ্য পদার্থই তাঁর অধীনস্থ হয়। সেই সব পদার্থ তিনি উদার-চিত্তে দেশ-কাল-পাত্র অনুযায়ী লোকহিতার্থে সদ্ব্যবহার করতে সচেষ্ট থাকেন। এরূপ সদ্ব্যক্তিদের সকল ক্রিয়া মূর্খ এবং অজ্ঞান ব্যক্তিদের বোধের অতীত। তারা নিজ অজ্ঞানাবৃত ক্রিয়াগুলির সঙ্গে তুলনা করে সদ্ব্যক্তিদের ক্রিয়াগুলির মধ্যে দোষ অনুসন্ধান করতে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরূপ স্বার্থবর্জিত মহাত্মাদের ক্রিয়াসমূহে দোষের লেশমাত্রও প্রবেশ করতে পারে না। ইহলোক অথবা পরলোকের কোনো কামনা অথবা স্বার্থ না থাকায় এরূপ মহাপুরুষদের আচরণ অজ্ঞান মানুষের কাছে দোষযুক্ত হলেও তা সর্বদাই পবিত্র হয়। মান-মর্যাদা, অহংকার ও জগতের কোনো কিছুর লোভ না থাকায় জগতের কোনো বস্তুই এঁদের সেসবের দিকে আকর্ষণ করতে পারে না। এঁরা নিত্য অভয়পদে অবস্থান করে কারো ভয়ও পান না এবং কারো সঙ্গে কঠোর ব্যবহারও করেন না। এই সকল মহাপুরুষ বিনয়, কোমলতা, সত্য ও শান্তির সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি হন। ক্ষমা তাঁদের স্বভাব হয়ে যায়, তাই তাঁদের মধ্যে কখনো ক্রোধের উৎপত্তি হয় না। কখনো সময়ানুসারে তাঁদের মধ্যে ক্রোধের বাহ্য ক্রিয়া পরিলক্ষিত হলেও, বস্তুত তাঁদের মধ্যে কখনো ক্রোধ জন্মায় না। সর্বত্র সবার মধ্যে সমবুদ্ধি হওয়ায় তাঁরা কখনো কারো অনুচিত নিন্দা বা স্তুতি করেন না। তাঁদের মধ্যে ছল-কপটতা কখনো থাকে না। যে সব স্থানে, কোনো কথা প্রকাশিত হলে কারো ক্ষতি হয় অথবা তাঁদের নিজেদের প্রশংসা হয়, সেসব যদি তাঁরা প্রকাশ না করেন, তাহলে তাঁদের আচরণকে

কপট, অসত্য বলে গণ্য করা যায় না।

উপসংহার

সৎ অত্যন্ত ব্যাপক বিষয়। এর উপরে অনেক কিছু লেখা হলেও তাতে মনের সব ভাব ব্যক্ত হয়নি। বিশদভাবে এর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু লিখিত বিষয় বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হল।

সৎ এমন এক বস্তু, যার আশ্রয় গ্রহণ করলে সমস্ত উত্তম গুণাদি আপনা-আপনি লাভ হয়। সত্যাশ্রয়ী সদ্‌ব্যক্তি সমস্ত সদ্‌গুণের সাগর ও জ্ঞানের ভাণ্ডার হয়ে ওঠেন। সত্যপালনের আরম্ভে সাধককে যদিও নানাপ্রকার কঠিন ও ক্লেশদায়ক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু সত্যে প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁর শোক ও মোহ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়। সুতরাং সত্যপালনকারী ব্যক্তির নির্ভয়ে নিজ লক্ষ্যে অটলভাবে বিরাজ করা উচিত। একদিকে সত্য ত্যাগ আর অপরদিকে প্রাণত্যাগ—এই দুটিকে বিচার করলে সত্যের দিকই অপেক্ষাকৃত শ্রেয় বলে মনে হয়। তাই মানুষ যদি প্রাণের মায়া ত্যাগ করে সত্যে অবিচল থাকে তাহলে সমস্ত বাধাবিপত্তি স্বতই দূরীভূত হয়। শেষে সেই সত্যেরই জয় হয়। উদাহরণস্বরূপ প্রহ্লাদের জীবন লক্ষ্য করা যায়। সত্যের জন্য কোনো প্রমাণের প্রয়োজন নেই। তা স্বয়ং স্বতপ্রমাণিত। অন্য সমস্ত প্রমাণের সিদ্ধি তো সত্যের ওপরেই আধারিত। সত্যের প্রতিপক্ষীরা সত্যকে ধ্বংস করার জন্য যতই উপায় অবলম্বন করুক, তাতে সত্যের কোনোরূপ ক্ষতি হয় না— উপরন্তু তাকে কষ্টিপাথরে যতই যাচাই করা হোক—অগ্নিদ্বারা তপ্ত স্বর্ণের ন্যায় সত্য ততই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। বাধা বিপত্তিতে যা নষ্ট হয়, তা কখনোই সত্য নয়। যিনি সত্য-পালনের মহত্ত্ব বিন্দুমাত্রও অনুভব করেছেন, তাঁর দ্বারা সত্যকে ত্যাগ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে, আর যিনি সত্যের তত্ত্ব সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত হয়েছেন, তাঁর পক্ষে সত্য হতে বিচলিত হওয়া কখনই সম্ভব হয় না। শুধুমাত্র সত্যতত্ত্ব জেনে গেলে মানুষ সমস্ত তত্ত্বের জ্ঞাতা হয়ে ওঠে, কারণ সত্য হল পরমাত্মার

স্বরূপ এবং পরমাত্মার জ্ঞানের দ্বারাই সমস্ত জ্ঞান লাভ হয় বলে প্রসিদ্ধি আছে। অতএব মনো-বাক্য এবং ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। সত্য সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত। অন্বেষণ করলে সর্বত্র সত্যেরই প্রতীতী ও অনুভূতি হয়ে থাকে। যা কিছু প্রতীত হয়, বিচার দ্বারা পরীক্ষা করলে অবশেষে একমাত্র সত্যই অবশিষ্ট থাকে। সমগ্র জগতের অস্তিত্ব সত্যের ওপরই বিরাজিত। সত্য বিনা কোনো পদার্থেরই সিদ্ধিলাভ হওয়া সম্ভব নয়। কেউ যদি ভ্রমবশত এর বিপরীতকে মেনে নেয়, তবে তা বজায় থাকে না। বৃষ্টি হলে যেমন বালির প্রাচীর বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারে না, তেমনই বিচারবুদ্ধি দ্বারা অন্বেষণ করলে অসত্যের অস্তিত্ব শীঘ্রই লুপ্ত হয়ে যায়। বালির প্রাচীর ভেঙে পড়লেও বালির কণিকা থেকে যায়, কিন্তু অসত্যের কণিকামাত্র দেখা যায় না। যা অসত্য তাকে যতই সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হোক না কোন, তা শেষ পর্যন্ত অসত্যই থেকে যায়—অস্তিত্বহীনই থাকে এবং সত্যকে দূর করার সমস্ত প্রচেষ্টাই নিষ্ফল হয়। সত্যের এমন মহত্ত্ব থাকা সত্ত্বেও যে মূর্খ ব্যক্তি সত্যকে ছেড়ে অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করে সে নিঃসন্দেহে দয়ার পাত্র বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং কল্যাণকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের উচিত প্রাণের থেকেও বেশি করে সত্যের সমাদর করা এবং সত্য পালনের জন্য অবিচলভাবে চেষ্টা করা।

———o———

পরমাত্মার জ্ঞানে পরম শান্তি

পরমাত্মা সর্বভূতের আত্মা, সর্বব্যাপী এবং সর্বান্তরযামী, তাই সকলের সেবাই ভগবানের সেবা—এই কথা অনুধাবন করলে মানুষ পরমাত্মাকে যথার্থরূপে জেনে তাকে লাভ করতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এইভাবে পরমাত্মার জ্ঞানে সে সেবার যোগ্য ব্যক্তির সেবা করে, পূজার যোগ্যকে পূজা করে সেই সেবা-পূজাকে ভগবানের সেবা-পূজাই মনে করে এবং তাতে তদনুরূপ আনন্দ ও শান্তি অনুভব করে যা সাক্ষাৎ ভগবানের সেবা পূজায় হয়। রাজা রন্তিদেবের মতন সে ভালোভাবে অনুভব করে যে এক ভগবানই বহু রূপে আবির্ভূত হয়ে প্রেমীর প্রেমপূর্বক করা দান, যজ্ঞ, সেবা ও পূজা আদি গ্রহণ করেন।

মহারাজ রন্তিদেব রাজা নরের পৌত্র ও রাজা সংস্কৃতির পুত্র ছিলেন। এঁর মহিমা স্বর্গ ও পৃথিবী দুই লোকেই প্রসিদ্ধ। একবার তিনি সমস্ত সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে দান করে দরিদ্র হয়ে সপরিবারে ক্ষুধায় কৃশ হয়ে অবস্থান করছিলেন। তিনি ক্রমাগত আটচল্লিশ দিন পর্যন্ত অন্ন তো নয়ই, জলও পেলেন না। সমগ্র পরিবার অনাহারে কষ্ট পেতে লাগল। ধর্মাত্মা রাজা রন্তিদেবের দেহ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাঁপতে লাগল। উনচল্লিশ দিনের দিন তিনি ঘৃত সহিত ক্ষীর, হালুয়া এবং জল পেলেন। রাজা সপরিবারে খেতে উন্মুখ হলে তখনই এক অতিথি ব্রাহ্মণ এলেন। সকলের মধ্যে হরিদর্শনকারী রাজা শ্রদ্ধা ও সমাদরে সেই খাদ্য ব্রাহ্মণ দেবতাকে ভোজন করালেন। ব্রাহ্মণ ভোজন করে চলে গেলেন। রাজা অবশিষ্ট অন্নকে পরিবারের মধ্যে ভাগ করে গ্রহণ করতে চাইলেন, তখনই গৃহে এক শূদ্র অতিথি এসে উপস্থিত হল। রন্তিদেব ভগবান হরির স্মরণ করে সেই অতিথিকেও আপ্যায়ন করলেন। আহার শেষ করে শূদ্র অতিথি চলে গেল। এমন সময়ে আরও এক অতিথি এল যার সঙ্গে কুকুরও ছিল। সে বলল— 'রাজন্! আমি ও আমার কুকুরগুলি অতিশয় ক্ষুধার্ত। আমাদের খেতে দিন।' রাজা তারও

সম্মান করলেন ও পরম সমাদরে তাকে ও তার কুকুরদের খাইয়ে দিলেন। এবারে কেবল একজনের তৃষ্ণা নিবারণ হতে পারে—এটুকুই জল অবশিষ্ট ছিল। রাজা তা পান করতে উদ্যত হলেন—ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ এক চণ্ডাল এল এবং সে করুণভাবে বলল — 'মহারাজ ! আমি বড় পরিশ্রান্ত, এই অধমকে তৃষ্ণা নিবারণের জল দিন।' তার করুণ কথাগুলি শ্রবণ করে রাজার দয়া হল। তিনি তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় হয়েও সেই জল তাকে দিয়ে দিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবই রাজা রন্তিদেবের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য মায়া দ্বারা ব্রাহ্মণাদি সেজে এসেছিলেন। রাজার ধৈর্য ও উদারতা দেখে তিনজনই অতিশয় সন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁরা নিজ স্বরূপ ধারণ করে রাজাকে দর্শন দিলেন। মহারাজ রন্তিদেব সাক্ষাৎ পরমাত্মাস্বরূপ সেই তিন জনকে প্রণাম করলেন এবং তাঁদের এত বেশি সন্তুষ্ট দেখেও বর চাইলেন না। আসক্তি ও স্পৃহা ত্যাগ করে রাজা মনকে কেবল বাসুদেবে যুক্ত করে দিলেন। এইভাবে ভগবানে তন্ময় হয়ে যাওয়ায় ত্রিগুণ (সত্ত্ব, রজ, তম)ময়ী মায়া তাঁর নিকট স্বপ্নের ন্যায় অন্তর্হিত হয়ে গেল। রন্তিদেবের সাধুসঙ্গে তাঁর পরিবারের লোকও নারায়ণের আশ্রিত হয়ে যোগীসম পরমগতি লাভ করলেন।

ভগবান সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ এবং ক্ষর-অক্ষর উভয় থেকেই অতিশয় শ্রেষ্ঠ। তিনি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর এবং অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু। তাঁর থেকে বড় জগতে কেউই নেই। যখন মানব এইরূপ বুঝতে পারে তখন সে ভগবানেরই ভজনা করে কারণ ভগবান স্বয়ং বলেন—

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত॥

(গীতা ১৫।১৯)

'হে ভারত ! যিনি আমাকে এইরূপে তত্ত্বত পুরুষোত্তম বলে জানেন সেই সর্বজ্ঞ পুরুষ সর্বতোভাবে সতত বাসুদেব পরমেশ্বররূপে আমারই ভজনা করেন।'

এই কথা সুপ্রসিদ্ধ যে মানুষ যে বস্তুকে সব থেকে বড় ভাবে তাকেই গ্রহণ করে। ধরা যাক একজন মহারাজা তাঁর মনের অনুকূল আচরণকারী এক অতিশয় প্রেমী গরীব সেবককে তার কার্যে সন্তুষ্ট হয়ে কিছু দিতে চান। এক

দিকে স্তূপাকার কয়লা, পাথর, কাঁকর আছে অন্য দিকে তাম্র, লৌহ, পিতল আদি কোথাও রৌপ্য ও ধনসম্পদ রাশি, কোথাও সুবর্ণ ও মোহর আদি এবং আর কোথাও হীরা, পান্না, নীলা, মাণিক আদি বহুমূল্য রত্ন রাখা আছে। সেই রাজা বললেন—সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত এর থেকে তোমার যা পছন্দ তা যত নিয়ে যেতে চাও বয়ে নিয়ে যাও। এবারে আপনিই বিচার করে বলুন, যে একটুও বুদ্ধি ধরে এমন ব্যক্তি কি হীরা, মাণিক আদি রত্ন ছেড়ে কাঁকর, পাথর বয়ে নিয়ে সময় নষ্ট করবে ? কখনই নয়। তাহলে ভগবানের তত্ত্ব, রহস্য, প্রভাব এবং গুণ জানা ভগবানের ভক্ত ভজন-ধ্যানাদি বহুমূল্য রত্ন ছেড়ে জগতের বিষয়রূপ কাঁকর পাথরে এক মুহূর্তও কেন নষ্ট করবে ? যদি সে আনন্দময় পরমাত্মাকে ছেড়ে সংসারের বিনাশশীল বিষয়ভোগে জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করে তাহলে বুঝতে হবে যে, সে সর্বশক্তিমান সর্বেশ্বর পরমাত্মার মহান প্রভাবকে ও রহস্যকে বুঝতে পারেনি।

দীনবন্ধু, পতিতপাবন, সর্বজ্ঞ পরমাত্মা সকল গুণের সাগর। তিনি কৃপা ও প্রেমের সাক্ষাৎ মূর্তি। এইভাবে পরমাত্মার গুণতত্ত্বের জ্ঞাতা পুরুষ নির্ভয় হয়ে যায়। তার তখন সীমাহীন আনন্দ ও শান্তি লাভ হয়। কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে ভগবান যখন প্রেম ও কৃপার মূর্তি তখন তাঁর অপার ও অপরিমিত কৃপা সকলের উপরেই থাকা উচিত আর যদি তাই হয় তাহলে আমাদের সুখ ও শান্তি কেন হয় না ? এর উত্তরে বলা যায় যে প্রভু অবশ্যই অপার ও অসীম কৃপাসাগর এবং তাঁর কৃপা সকলের উপর সমানভাবে রয়েছে কিন্তু সত্য কথা হল যে আমরা এমন বিশ্বাস করি কোথায় ? প্রভুর সকল জীবের উপর এত দয়া যে তা আমরা অনুমান করতে পারি না। আমরা যত দয়া অনুমান করি তার থেকে অনেক বেশি ও অপার দয়া সকল জীবের উপর আছে কিন্তু সেই অনন্ত দয়ার তত্ত্ব ও প্রভাব না জানার জন্য আমরা সেই কথার উপর বিশ্বাস রাখি না তাই সেই নিত্য ও অপার দয়ার ফলস্বরূপ সুখ ও শান্তি থেকে বঞ্চিত থেকে যাই। যদিও ভগবানের দয়া সাধারণভাবে সকল জীবের উপর বর্তমান কিন্তু মুক্তির পরম অধিকারী হওয়ায় মানুষ সেই দয়ার বিশেষ পাত্র হয়। মানুষের মধ্যে সেই বিশেষ অধিকারী যে সেই দয়ার রহস্য ও প্রভাব সম্বন্ধে অবগত। যেমন সূর্যালোক সমভাবে সর্বত্র হলেও উজ্জ্বল হওয়ায় কাচ তার

বিশেষ পাত্র কারণ সূর্যের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, আর কাচের মধ্যে আতস কাচ তো সূর্যের শক্তি নিয়ে বস্ত্রাদি পদার্থও পুড়িয়ে ফেলে। এইভাবে সকল জীবের উপর প্রভুর দয়া সমানভাবে থাকলেও যে ব্যক্তি সেই দয়ার তত্ত্ব ও প্রভাবকে বিশেষভাবে জানে সে সেই দয়ার দ্বারা সমস্ত পাপতাপকে সহজেই ভস্ম করে ফেলে। মানুষ প্রভুর দয়ার তত্ত্ব ও প্রভাবকে যত বেশি জানতে পারে ততই তার দুঃখ, দুর্গুণ ও পাপের নাশ হতে থাকে এবং তার ফলে সে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হয়ে পরম শান্তি ও পরমানন্দ লাভ করে।

মনে করুন, একজন রাজা অতিশয় ধার্মিক ও জ্ঞানী। প্রজার প্রতি তাঁর স্বাভাবিকভাবে গভীর দয়া ভাব বর্তমান কিন্তু প্রজাগণ সকলে সেই কথা জানে না। তিনি নিজে মন্ত্রী ও গুপ্তচরদের সাহায্যে অসহায় ও দীনদরিদ্র প্রজাদের সতত খোঁজ রাখতেন এবং সকলকে যথাযোগ্য সাহায্য পাঠিয়ে দিতেন। সেই রাজধানীতে এক ক্ষত্রিয় বালক থাকত যে অতিশয় সুশীল, সদাচারী, বুদ্ধিমান ও পারদর্শী ছিল আর তার রাজার উপর প্রবল শ্রদ্ধা ছিল। বালকের পিতা-মাতা তার শৈশবেই দেহত্যাগ করেছিলেন। সেই বালক পিতা-মাতার কাছেই শুনেছিল যে রাজা অতিশয় দয়ালু ও অনাথবৎসল। তাই যখন সে পিতা-মাতাকে হারালো তখন তার যতটা চিন্তা হওয়ার কথা ছিল ততটা হয়নি। সে ভাবত যে দয়ালু রাজা নিজের থেকেই তার ব্যবস্থা করে দেবেন। সেই বালক স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। তার বন্ধুবান্ধবগণ দেখত যে অনাথ হয়েও সে খুবই নিশ্চিন্ত। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল—'তোমার পিতা-মাতা তো মারা গেছেন, এখন তোমার চলবে কী করে ?' সে উত্তর দিল—আমাদের রাজা অতিশয় দয়ালু, স্বয়ং তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন। এই কথা গুপ্তচরদের মাধ্যমে রাজার কানে উঠল। রাজা মন্ত্রীদের দিয়ে তার সব খবর জোগাড় করলেন। মন্ত্রীগণ বললেন—এই বালক অতিশয় সুন্দর, সুশীল, সদাচারী, ধার্মিক, বুদ্ধিমান ও রাজভক্ত। তার পিতা-মাতা বেঁচে নেই তাই এখন সে সর্বতোভাবে অনাথ। এখন তার কেবল আপনার উপরই ভরসা। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—'তার জন্য কী ব্যবস্থা করা যায় ?' মন্ত্রীগণ বললেন —'আপনি যেমন ভালো বোঝেন।' রাজা তার খাওয়া-পরা এবং লেখাপড়ার ব্যবস্থা এবং থাকবার জন্য বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার জন্য

আদেশ দিলেন। রাজার এইরূপ উদার ব্যবহারে মন্ত্রীগণ অতিশয় প্রসন্ন হলেন। যখন এই কথা বালক জানতে পারল তখন তার আনন্দের সীমা রইল না। তার রাজার উপর ভক্তি আরও বেড়ে গেল আর বিশ্বাস চারগুণ হয়ে গেল।

একদিন যখন বালক স্কুলে পড়ছিল তখন তার এক বন্ধু এসে দুঃখিত হয়ে বলল—'ভাই! তুমি কী এমন অপরাধ করেছ যে রাজার পেয়াদা তোমার কুঁড়ে ঘর ভাঙছে?' বালক অতিশয় প্রসন্ন ভাবে উত্তর দিল—'ভাই! রাজা আমাকে খুব ভালোবাসেন। হয়তো তিনি আমার কুঁড়ে ঘর ভেঙে ভালো বাড়ি করে দিচ্ছেন।' এই কথাও গুপ্তচরদের সাহায্যে রাজা জানতে পারলেন। রাজার ভালোবাসা বালকের উপর আরও বেড়ে গেল। একদিন রাজা তাঁর মন্ত্রীদের জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনারা জানেন যে আমার বয়স হয়ে যাচ্ছে। আমার তো কোনো সন্তান নেই, তাই এখন কাকে যুবরাজ করা যায়?' মন্ত্রীগণ বললেন—'আপনি যাকে যোগ্য মনে করেন তাকেই করুন।' রাজা বললেন—'আমি তো সেই অনাথ ক্ষত্রিয় বালককে—যার আপনারা সতত প্রশংসা করে থাকেন, এই যুবরাজ পদের যোগ্য মনে করি।' আপনাদের সম্মতি আছে তো? এইটুকু শুনেই মন্ত্রীসকল একযোগে বললেন—'উত্তম প্রস্তাব। সেই কুমার অতি সুন্দর, সুশীল, সৎচরিত্র, বুদ্ধিমান, রাজভক্ত ও ধার্মিক। সে সব দিক দিয়ে যুবরাজ পদের উপযুক্ত।' মন্ত্রীদের সম্মতি লাভ করে রাজা বালককে যুবরাজ করবার কথা ঠিক করে ফেললেন। এই কথা রাজ্যের উচ্চ পদাধিকারীগণ জানতে পারলেন। একদিন বালকের গৃহে কিছু মান্যগণ্য ব্যক্তিদের আগমন হল। বালক তাঁদের আদর যত্ন অভ্যর্থনা করল। তাঁরা বললেন—'আপনার উপর রাজা মহাশয় কৃপা করেছেন।' ক্ষত্রিয় বালক বলল—'আমি তো আগের থেকেই জানি যে মহারাজ আমাকে ভালোবাসেন তাই তো তিনি আমার খাওয়া-পরা, পড়াশুনা ও ঘর-দুয়ারের সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।' রাজকর্মচারী বললেন—'কেবল তাই নয় মহারাজ আপনার উপর এত বড় কৃপা করেছেন যে তা আপনি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবেন না।' তখন বালক বলতে লাগল—'তাহলে কি মহারাজ আমার বিবাহের খরচ দিতে রাজি হয়েছেন?'

রাজকর্মচারী বললেন— 'বিবাহ তো মামুলি কথা, মহারাজ আপনার উপর অতিশয় কৃপা করেছেন।' বালক বলল—'তাহলে কি মহারাজ আমাকে দু-চারটে গ্রাম দিতে চান ?' রাজকর্মচারী বললেন—'মহারাজের আপনার উপর এর থেকে অনেক বেশি কৃপা আছে।' বালক বলল—'আমি তো এর বেশি কিছু জানি না, আপনারাই বলে দিন আসল কথা।' রাজকর্মচারী বললেন —'বলি কি আমরা সকলে নিজেদের উপর আপনার কৃপা কামনা করি।' বালক বলল— 'ও কথা বলবেন না, আমি তো আপনাদের সেবক মাত্র। আপনাদের কৃপাতেই মহারাজের আমার উপর কৃপা হয়েছে। মহারাজের বিশেষ দয়ার কথাটা তো বলুন।' রাজকর্মচারী বললেন—'আমরা তো বলেছি যে আমরা সতত আপনার কৃপা কামনা করি। আপনি কি আমাদের কথার অর্থ বুঝতে পারছেন না ?' কুমার বলল—'দয়া করে স্পষ্ট করে বলুন।'

এই অসহায় অনাথ বালক কেমন করে কল্পনা করবে যে মহারাজ তাকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী করে যুবরাজ পদ পর্যন্ত দিতে পারেন !

রাজকর্মচারী বললেন— 'শ্রীমান আপনাকে যুবরাজ করেছেন।' শুনেই বালক আশ্চর্য হয়ে বলে ফেলল— 'যুবরাজ করেছেন ?' রাজকর্মচারী বললেন—'সত্যই তাই। যুবরাজ করেছেন।' এইবার বালকের আনন্দের সীমা রইল না, সে আনন্দ মগ্ন হয়ে গেল।

এটি তো এক দৃষ্টান্ত মাত্র ; এভাবে কল্পনা করুন রাজা মহাশয় হলেন ভগবান, সাধক ক্ষত্রিয় বালক। ভগবদ্ভক্তিই রাজভক্তি, সাধকের 'যোগক্ষেম'ই খাওয়া-পরা-গৃহ আদির ব্যবস্থা, ভগবৎপ্রাপ্ত ব্যক্তিই মন্ত্রী। দৈবসম্পদসম্পন্ন মুমুক্ষু ব্যক্তিই রাজকর্মচারী এবং ভক্তি শিরোমণি কারক-পুরুষের সর্বোচ্চ পদই যুবরাজপদ।

এইভাবে যে সাধক পরমপিতা পরমাত্মার অসীম দয়ার অনুভব করে তাঁর প্রতি বিধানে পদে পদে আহ্লাদিত হয় সে এই অবিনাশী যুবরাজ পদের অধিকারী হয়।

তাই আমাদের পরমশান্তি এবং পরমানন্দ লাভ করবার জন্য সেই সর্বব্যাপী, সর্বান্তর্যামী, সর্বশক্তিমান, পরম দয়ালু এবং সকলের সুহৃদ পরমেশ্বরকে তাঁর স্বরূপ, প্রভাব ও গুণসহ জানবার চেষ্টা করা উচিত।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥

(গীতা ৫।২৯)

'আমার ভক্ত আমাকে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর (ঈশ্বরের ঈশ্বর) এবং সকল প্রাণীর সুহৃদ অর্থাৎ স্বার্থরহিত দয়ালু ও প্রেমিক—এইরূপ তত্ত্বত জেনে শান্তি লাভ করেন।'

প্রশ্ন—'যজ্ঞ ও তপস্যা' কী ? ভগবান তার ভোক্তা কেমন করে এবং তাঁকে ভোক্তা জেনে মানুষ শান্তি কেমন করে পায় ?

উত্তর—অহিংসা, সত্য আদি ধর্মসকল (যম নিয়মাদি) পালন, দেবতা, ব্রাহ্মণ, মাতা-পিতা আদি গুরুজনদের সেবা-পূজা, দীন-দুঃখী, গরীব এবং পীড়িত জীবের স্নেহ এবং সমাদরে সেবা এবং তাদের দুঃখনাশের জন্য কৃত উপযুক্ত সাধনা এবং যজ্ঞ, দান আদি যত শুভকর্ম আছে সেই সকলের সম্মিলিত রূপকে 'যজ্ঞ' ও 'তপস্যা' মনে করা উচিত। ভগবান সকলের আত্মা (গীতা ১০।২০) ; অতএব দেবতা, ব্রাহ্মণ, দীন-দুঃখী প্রভৃতির অন্তরে স্থিত হয়ে ভগবানই সমস্ত সেবা-পূজাদি গ্রহণ করেন। তাই বস্তুত তিনিই সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা (গীতা ৯।২৪)। ভগবানের তত্ত্ব ও প্রভাব না জানার জন্যই মানুষ যাঁর সেবাপূজা করে সেই দেব-মনুষ্যাদিকেই যজ্ঞ এবং সেবা আদির ভোক্তা ভাবে তাই তারা অল্প ও বিনাশী ফলের ভাগী হয় (গীতা ৭।২৩) এবং তাদের যথার্থ শান্তি লাভ হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবানের তত্ত্ব ও প্রভাবকে জানে, সে সকলের ভিতরে আত্মরূপে বিরাজিত ভগবানকেই দেখে। এইভাবে প্রাণীমাত্রেই ভগবদ্বুদ্ধি হওয়ার কারণে যখন সে যারই সেবা করে সে অনুভব করে যে, আমি দেব-ব্রাহ্মণ অথবা দীন-দুঃখী আদির রূপে নিজের পরম পূজনীয়, পরম প্রেমাস্পদ সর্বব্যাপী শ্রীভগবানেরই সেবা করছি। মানুষ যাকে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানীয় মনে করে, যার প্রতি একটুও শ্রদ্ধাভক্তি থাকে, যার প্রতি সামান্যও আন্তরিক প্রকৃত প্রেম থাকে, তার সেবার দ্বারা তার অতিশয় আনন্দ ও বিলক্ষণ শান্তি লাভ হয়। পিতৃভক্ত পুত্র, স্নেহময়ী মাতা ও প্রেমপ্রতিমা পত্নী কি নিজ পিতা,

পুত্র এবং পতির সেবা করতে কখনো ক্লান্ত হয় ? প্রকৃত শিষ্য বা অনুগমনকারী ব্যক্তি কি নিজ শ্রদ্ধেয় গুরু বা পথপ্রদর্শক মহাত্মার সেবা থেকে কোনো কারণে সরে যেতে চায় ? যে পুরুষ অথবা নারী যাঁর দ্বারা গৌরব, প্রভাব বা প্রেম লাভ করে তাঁর সেবার সুযোগ পেলে তাঁর অন্তরে ক্ষণেক্ষণে নব নব উৎসাহরূপী প্রবাহ উৎপন্ন হয় ; তখন মনে হয় যে, যা কিছু সেবা করা হয় তাই অল্প। এই সেবার দ্বারা সে মনে করে না যে আমরা এঁর উপকার করছি ; তাঁর মনে সেবার অহংকার হয় না বরং এমন সেবার সুযোগ পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে আর যতই সেবা হয় ততই বিনয় ও প্রকৃত নম্রতা বৃদ্ধি পায়। তাঁর মনে অহংকারের প্রশ্নই ওঠে না, বরং পদে পদে এই ভয় থাকে যে এই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত না হয়ে যাই। এর কারণ হল সে সেবার মাধ্যমে তারা চিত্তে অপূর্ব শান্তির অনুভূতি পায় কিন্তু এই শান্তি তাকে সেবা করা থেকে বিরত করে না কারণ তার চিত্ত আনন্দাধিক্যে উত্তাল হয় আর সে আনন্দে সন্তুষ্ট না হয়ে উত্তরোত্তর আরও সেবা করতে চায়। যখন জাগতিক গৌরব, প্রভাব ও প্রেমে সেবা এত প্রীতিপূর্ণ, গভীর ও শান্তিপ্রদ হয় তাহলে ভগবানের যে ভক্ত সকলরূপে অখিল বিশ্বের পরমপূজ্য, দেবাধিদেব, সর্বশক্তিমান, পরম গৌরব ও অচিন্ত্য প্রভাবের নিত্য ধাম নিজ পরম প্রিয়তম ভগবানকে চিনে নিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে নিষ্কামভাবে তাঁর সেবা করতে থাকে, ঈশ্বরের প্রতি প্রবাহিত সতত সুধাময়ী ধারাকে প্রেমরসে সিঞ্চিত করে পূজার দ্বারা ভক্ত যে অলৌকিক আনন্দ ও দিব্য সুখানুভূতি লাভ করেন সেটি কেউ বর্ণনা করতে পারেন না। যাঁর ভগবৎকৃপার এমন সৌভাগ্য লাভ হয় তিনিই বস্তুত এর অনুভব করতে পারেন।

প্রশ্ন—ভগবানকে **'সর্বলোকমহেশ্বর'** ভাবা কী ? এমন জ্ঞানযুক্ত কেমন করে শান্তি পায় ?

উত্তর—ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, যমরাজ আদি যত লোকপাল আছেন আর বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে নিজ নিজ ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রণকারী যত ঈশ্বর আছেন ভগবান তাঁদের সকলের প্রভু ও মহান ঈশ্বর। তাই শ্রুতিতে বলা হয়— **'তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্'**—সেই ঈশ্বরেরও পরম মহেশ্বরকে' (শ্বেত. উ. ৬।৭)।

নিজ অনির্বচনীয় মায়াশক্তি দ্বারা ভগবান নিজ লীলার দ্বারাই কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করে সকলকে যথাযোগ্য নিয়ন্ত্রণে রাখেন এবং তা সত্ত্বেও তিনি সকলের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। এইভাবে ভগবানকে সর্বশক্তিমান, সর্বনিয়ন্তা, সর্বাধ্যক্ষ, সর্বেশ্বরেশ্বর জানা হল তাঁকে 'সর্বলোকমহেশ্বর' ভাবা। এরূপ জ্ঞাত ভক্ত ভগবানের মহান প্রভাব এবং রহস্য থেকে অভিজ্ঞ হওয়ায় মুহূর্তের জন্যও ভগবানকে ভুলতে পারে না। সে সতত নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁকে একনিষ্ঠভাবে চিন্তা করে। শান্তিতে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী কাম-ক্রোধাদি শত্রু তার কাছেও ঘেঁষে না। তাঁর দৃষ্টিতে ভগবানের থেকে বড় কেউ নয়। তাই সে তাঁর চিন্তায় সংলগ্ন হয়ে সতত পরমশান্তি ও আনন্দের মহান সমুদ্র ভগবানের ধ্যানেই ডুবে থাকে।

প্রশ্ন—ভগবান সকল প্রাণীর সুহৃদ কীভাবে এবং তাঁকে সুহৃদ জানলে শান্তি কেমন করে লাভ হয় ?

উত্তর—সম্পূর্ণ জগতে এমন কোনো বস্তু নেই যা ভগবানের অপ্রাপ্ত আর এতে ভগবানের কোথাও কারো সঙ্গে স্বার্থের বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ নেই। ভগবান তো সতত সর্বভাবে পূর্ণকাম (৩।২২) ; তবুও দয়াময়স্বরূপ হওয়ায় তিনি স্বাভাবিকভাবেই সকলের উপর অনুগ্রহ করে সকলের হিতের ব্যবস্থা করেন আর বারে বারে অবতীর্ণ হয়ে নানা চরিত্র-লীলা করেন যা সংকীর্তন করে লোকেরা মুক্তি লাভ করে। তাঁর প্রতিটি কার্যে জগতের হিতাকাঙ্ক্ষা থাকে। ভগবান যাকে বধ করেন বা দণ্ড দেন তার উপরও তিনি দয়া করেন। তাঁর কোনো বিধানই দয়া ও প্রেমরহিত হয় না। তাই ভগবান সর্বভূতের সুহৃদ। লোকেরা এই রহস্য বোঝে না তাই তারা লৌকিক দৃষ্টিতে ইষ্ট-অনিষ্ট প্রাপ্তিতে সুখী-দুঃখী হয়ে থাকে ; ফলে তারা শান্তি লাভ করে না। যে এই কথা জানে ও বিশ্বাস করে যে 'ভগবান আমার অহৈতুক প্রেমী, তিনি যা কিছু করেন আমার মঙ্গলের জন্যই করে থাকেন ; সে যা কিছু ঘটে তাকে দয়াময় পরমেশ্বরের প্রেম ও দয়াতে পরিপূর্ণ মঙ্গলবিধান মনে করে সতত প্রসন্ন থাকে। তাই সে অবিচল শান্তি লাভ করে থাকে। সেই শান্তিতে কোনো প্রকারের বাধা উপস্থিত করবার কোনো হেতু থাকে না। সংসারে যদি কোনো সাধারণ মানুষের প্রতি কোনো শক্তিশালী উচ্চপদস্থ অধিকারী অথবা রাজা-

মহারাজার সুহৃদভাব হয়ে যায় আর সেই ব্যক্তি এই কথাকে জানতে পারে যে সেই শ্রেষ্ঠ শক্তিধর পুরুষ তার যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী আর রক্ষক তাহলে, যদিও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বা রাজা-মহারাজা সতত স্বার্থরহিতও হন না, সর্বশক্তিমানও হন না এবং সকলের প্রভুও হন না—তবুও সে নিজেকে অনেক ভাগ্যবান মনে করে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হয়ে আনন্দমগ্ন হয়ে যায়। তাহলে সর্বশক্তিমান, সর্বলোকমহেশ্বর, সর্বনিয়ন্তা, সর্বান্তর্যামী, সর্বদর্শী, অনন্ত, অচিন্ত্য গুণের সাগর পরমপ্রেমী পরমেশ্বর যদি নিজেকে আমাদের সুহৃদ বলে ঘোষণা করেন এবং আমরা এই কথায় বিশ্বাস করে তাঁকে সুহৃদ মেনে নিই তাহলে আমাদের কত অলৌকিক আনন্দ ও কেমন অপূর্ব শান্তি লাভ হবে ? এর অনুমান করাও কঠিন।

প্রশ্ন—এইভাবে যে ভগবানকে যজ্ঞ-তপস্যার ভোক্তা, সমস্ত লোকের মহেশ্বর এবং সকল প্রাণীর সুহৃদ—এই তিন লক্ষণযুক্ত জানে সেই শান্তি লাভ করে না, এর মধ্যে যে ভগবানকে কোনো একটি দ্বারা যুক্ত মনে করে—সেই শান্তি লাভ করে ?

উত্তর—ভগবানকে এর মধ্যে যে কোনো একটি লক্ষণযুক্ত ভাবলেও শান্তি পাওয়া যায় আর তিন লক্ষণযুক্ত ভাবলে তো কথাই নেই ! এর কারণ এই যে, কোনো একটি লক্ষণকে যে ভালোভাবে বুঝে যায় সে অনন্যভাবে ভগবানের ভজনা না করে থাকতে পারে না। ভজনার প্রভাবে তার উপর ভগবৎ কৃপার বর্ষণ হতে থাকে এবং ভগবৎ কৃপায় সে অতি-শীঘ্রই ভগবানের স্বরূপ প্রভাব, তত্ত্ব ও গুণ জ্ঞাত হয়ে পূর্ণ শান্তি লাভ করে। আহা ! তখন কত আনন্দ ও কেমন শান্তি লাভ হয় যখন মানুষ জানতে পারে যে সম্পূর্ণ দেবতা ও মহর্ষিগণ দ্বারা পূজিত ভগবান, যিনি সমস্ত যজ্ঞের-তপস্যার একমাত্র ভোক্তা এবং সম্পূর্ণ ঈশ্বরের ও অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পরম মহেশ্বর, তিনিই তার পরমপ্রেমী মিত্র ! কোথায় নগণ্য ও ক্ষুদ্রতম সে আর কোথায় অনন্ত অচিন্ত্য মহিমায় নিত্যস্থিত মহান মহেশ্বর ভগবান ! আহা ! তার চেয়ে সৌভাগ্যবান আর কে ? আর সেই সময় সে অন্তরের কোন্ অপূর্ব কৃতজ্ঞতা নিয়ে কোন্ পবিত্র ভাবধারাতে সিক্ত হয়ে কোন্ আনন্দার্ণবে নিমজ্জিত হয়ে ভগবানের পবিত্র চরণে পূর্ণভাবে লুটিয়ে পড়ে ! বস্তুত তা

বুদ্ধির অগম্য।

প্রশ্ন— ভগবান সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা সব লোকের মহেশ্বর এবং সকল প্রাণীর সুহৃদ—এই কথা বোঝবার উপায় কী ? কোন্ উপায়ে মানুষ ভগবানের স্বরূপ, প্রভাব, তত্ত্ব ও গুণকে উত্তমরূপে অনুধাবন করে তাঁর অনন্য ভক্ত হতে পারে ?

উত্তর—শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে মহাপুরুষের সঙ্গ, সদ্‌শাস্ত্রসকলের শ্রবণ-মনন এবং ভগবানের শরণ নিয়ে অতিশয় উৎসুক হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে তাঁর দয়ায় মানুষ ভগবানের এই প্রভাব ও গুণকে বুঝে তাঁর অনন্যভক্ত হতে পারে।

প্রশ্ন—এইখানে 'মাম্' পদে ভগবান তাঁর কোনো স্বরূপকে লক্ষ্য করেছেন ?

উত্তর—যে ভগবান অজ, অবিনাশী এবং সকল প্রাণীকুলের মহান ঈশ্বর হয়েও কখনো কখনো নিজ প্রকৃতি স্বীকার করে লীলা করবার জন্য যোগমায়ায় জগতে অবতীর্ণ হন আর যিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়ে অর্জুনকে উপদেশ দেন সেই নির্গুণ, সগুণ, নিরাকার, সাকার এবং অব্যক্ত-ব্যক্তস্বরূপ, সর্বরূপ, পরব্রহ্ম পরমাত্মা, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী, সর্বাধার এবং সর্বলোক মহেশ্বর পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করে 'মাম্' পদ প্রয়োগ করা হয়েছে।

ওই শ্লোকে **'ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্'** এই বিশেষণ—পরমাত্মাই সকলের আত্মা এই ভাবের বাচক হওয়ায় তার সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ ও সর্বান্তর্যামী স্বরূপ নির্দেশ করে। **'সর্বলোকমহেশ্বরম্'** এই বিশেষণ পরমাত্মাই সকলের প্রভু এই ভাবের বাচক হওয়ায় তাঁর সর্বশক্তিমান হওয়া, সর্বৈশ্বর্য এবং অপরিমিত প্রভাবকে চিহ্নিত করে এবং **'সুহৃদং সর্বভূতানাম্'**—এই বিশেষণ পরমাত্মা বিনা কারণে সর্বভূতের পরম হিতৈষী—এই ভাবের বোধক হওয়ায় তাঁর অপার ও অপরিমিত দয়া, প্রেম আদি শ্রেষ্ঠ গুণের দ্যোতন করে।

এমন দয়াসিন্ধু ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁর গুণ, প্রভাব ও রহস্যের তত্ত্ব জানা ও তাঁকে লাভ করবার জন্য নিম্নোক্তভাবে প্রার্থনা করা উচিত।

'হে নাথ। আপনি দয়ার সাগর, সর্বান্তর্যামী, সর্বেশ্বর, সর্বশক্তিমান

এবং সর্বজ্ঞ। আপনার কিঞ্চিত দয়াতেই সম্পূর্ণ জগৎ-সংসারের এক মুহূর্তে উদ্ধার হতে পারে তাহলে আমাদের মতন তুচ্ছ জীবের কথা বলার কী আছে ? তাই আমি আপনাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে সবিনয় প্রার্থনা করি যে, হে দয়াসিন্ধু ! আমাদের উপর কৃপাদৃষ্টি দিন যাতে আপনাকে যথার্থরূপে জানতে পারি। যদিও আপনার সকলের উপর অপার দয়া কিন্তু তার রহস্য না জানবার জন্য আমরা সেই কৃপা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। তাই কৃপা করুন যাতে আমরা সেই কৃপার রহস্য বুঝতে পারি। যদি আপনি কেবল দয়াসাগরই হতেন আর অন্তর্যামী না হতেন তাহলে আমাদের অন্তরের পীড়াকে জানতে পারতেন না ; কিন্তু আপনি তো সকলের অন্তরে বিরাজমান অন্তর্যামীও, তাই আপনার বিয়োগে আমাদের যে দুর্দশা হচ্ছে তা আপনি অবগত আছেন। আপনি দয়াসাগর ও সর্বান্তর্যামী হয়েও যদি সর্বেশ্বর ও সর্বসামর্থ্যবান না হতেন তাহলে আমরা আপনার কাছে আমাদের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করতাম না। কিন্তু আপনি তো সর্বলোক মহেশ্বর এবং সর্বশক্তিমান তাই আমাদের মতন তুচ্ছ জীবের এই মৃত্যুরূপ ভবসাগর থেকে উদ্ধার করা আপনার পক্ষে এক অতিশয় সহজ কাজ।

আমরা তো আপনার কাছে এই চাই যে আপনাতেই আমাদের অনন্য প্রীতি হোক। আমাদের অন্তরে সতত আপনারই চিন্তা অধিষ্ঠান করুক আর আপনার থেকে কখনো বিয়োগ না হয়। আপনি এমনই সুহৃদ যে কেবল ভক্তের নয় পতিত ও মূর্খেরও উদ্ধার করে থাকেন। আপনার পতিতপাবন, পাতকীতারণ আদি নাম প্রসিদ্ধ তাই জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তি ও সদাচারহীন আমাদের মতন মূঢ় ও পতিতের উদ্ধার করা আপনার পরম কর্তব্য।

একান্তে বসে এই ভাবে নির্মল চিত্তে করুণাভাবে গদগদ হয়ে উক্ত ভাবের অনুসারে যে কোনো ভাষায় প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলে ভগবৎ-কৃপারূপ গুণ, প্রভাব ও তত্ত্বসহিত ভগবানকে জেনে মানুষ পরমশান্তি লাভ করে।

---o---

চাদরের মাধ্যমে জ্ঞান-বৈরাগ্য প্রভৃতির শিক্ষা

জগতে এখন জ্ঞানদাতা প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া যায় কিন্তু শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তি অতি অল্পই দেখা যায়। সর্বত্র সারে সারে উপদেশ দানকারী গুরু দেখতে পাই কিন্তু উপদেশ ধারণ করে তার থেকে উপকৃত হওয়া শিষ্যদের সংখ্যা নগণ্য। কবিগণও বলেছেন—'**পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং সর্বোষাং সুকরং নৃণাম্।' 'পর উপদেশ কুসল বহুতেরে। জে আচরহিঁ তে নর ন ঘনেরে ॥'** উপদেশ দেওয়া যত সহজ তা পালন করা ততই কঠিন। উপদেশ তো নিজের জন্য হওয়া উচিত অপরের জন্য নয় ; তবেই আমাদের উন্নতি হওয়া সম্ভব। জ্ঞান লাভ তারই হয়ে থাকে যে অহংকার ত্যাগ করে শিক্ষা গ্রহণে উৎসুক থাকে। যে শিক্ষা লাভ করতে চায় তার জন্য শিক্ষকের কোনো অভাব নেই। প্রকৃত গুরু যোগ্য শিষ্য স্বয়ং খুঁজে বার করেন। প্রকৃত জিজ্ঞাসুর জন্য তো স্বয়ং ভগবান গুরুরূপে আবির্ভূত হয়ে তাকে উপদেশ দান করে কৃতার্থ করেন। সম্রাট পরীক্ষিৎ যখন রাজ্যপাট, আত্মীয়-স্বজন এবং দেহের মোহ ত্যাগ করে সর্বতোভাবে চিত্ত নিরোধ করে জ্ঞান-লাভের জন্য আত্মকল্যাণের শিক্ষা হেতু অন্নজল ত্যাগ করে ভগবতী গঙ্গার পবিত্র তীরে প্রায়োপবেশন করলেন তখন তাঁর জ্ঞানপিপাসা শান্ত করবার জন্য, তাঁকে মুক্তির পথ প্রদর্শনের জন্য চতুর্দিক থেকে বহু মুনিঋষিগণ স্বেচ্ছায় তাঁর কাছে আসতে লাগলেন। স্বয়ং শুকদেব মুনি—যিনি এত বৈরাগ্যযুক্ত ছিলেন যে একটি গোদোহন কালও তাঁর লোকালয়ে অবস্থান হত না আর তিনি সতত সমাধিমগ্ন থাকতেন, তিনিও তাঁর কাছে অনাহূত হয়ে এসে সাত দিন পর্যন্ত তাঁকে শ্রীমদ্ভাগবত কথা শুনিয়েছিলেন। বিদ্বজ্জন বলে থাকেন যে শ্রীশুক মুনি নিত্যদেহ বা সিদ্ধদেহসম্পন্ন তাই তিনি এখনও প্রায়ই আবির্ভূত হয়ে শ্রবণ অধিকারীদের উপদেশ দান করে কৃতার্থ করে থাকেন। বলা হয় যে সন্ত চরণদাসকে তিনিই গুরুরূপে দীক্ষা দান করেছিলেন। সন্ত চরণদাস রচিত পদগুলিতে এঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। স্বামী শ্রীশঙ্করাচার্যর পরমগুরু

আচার্য গৌড়পাদেরও শ্রীশুকদেবের কাছেই দীক্ষা লাভ হয়েছিল, এমন কথা শোনা যায়। স্বয়ং স্বামী শ্রীশঙ্করাচার্যকেও শ্রীবেদব্যাস দর্শন দান করেছিলেন, তাঁর জীবনীতে এঁর উল্লেখ আছে। দেবর্ষি নারদের বাল্মীকি, ব্যাস ও ধ্রুব আদির কাছে স্বয়ং গমন করে তাঁদের উপদেশ দান করবার কথাও সুপ্রসিদ্ধ।

কেবল তাই নয় যারা শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক তারা জগতের চরাচর সকল বস্তুর কাছেই শিক্ষা লাভ করতে পারেন। এই বিশ্বই এক মহাবিদ্যালয়। নদীসকল, সমুদ্র, বৃক্ষ,পর্বত, গ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ, পৃথিবী, বায়ু, পশু-পক্ষী আদি নানা প্রকারের জীব—সকলই আমাদের শিক্ষা দান করে। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা আছে যে ভগবান দত্তাত্রেয় চব্বিশজনকে গুরু করেছিলেন—যাতে পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য, কপোত, অজগর, সমুদ্র, পতঙ্গ, মৌমাছি, হাতি, হরিণ, মাছ, বেশ্যা, কুররপক্ষী, বালক, কুমারী কন্যা, শরনির্মাতা, সর্প, মাকড়সা এবং ভ্রমর পর্যন্ত ছিল। আজ আমরা পাঠকদের বলব যে, যে চাদরকে আমরা অঙ্গে জড়াই তার থেকেও আমরা জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, কর্ম এবং ভগবৎ শরণাগতির শিক্ষা পেতে পারি।

প্রথমে আমরা প্রভুর শরণাগতির প্রসঙ্গ আলোচনা করেছি। শাস্ত্রে শরণাগতির অনেক মহিমা সংকীর্তিত হয়েছে। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

(১৮।৬২)

'হে ভারত ! তুমি সর্বতোভাবে, সেই পরমেশ্বরেরই শরণাগত হও। তাঁর কৃপাতেই তুমি পরমশান্তি এবং সনাতন পরমধাম লাভ করবে।'

মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামে ভীষ্ম পিতামহ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—

বাসুদেবাশ্রয়ো মর্ত্যো বাসুদেবপরায়ণঃ।
সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা যাতি ব্রহ্ম সনাতনম্॥

'ভগবান বাসুদেবের আশ্রয়ে তাঁর পরায়ণ থাকা ব্যক্তি সম্পূর্ণ পাপে

বিরহিত ও বিশুদ্ধ অন্তঃকরণযুক্ত হয়ে সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করেন।'

যোগদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন—

'ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা।' (যোগদর্শন ১।২৩)

'ঈশ্বরের শরণ গ্রহণকারীরও চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়ে সমাধি লাভ হয়ে থাকে।'

যে শরণাগতি প্রসঙ্গে শাস্ত্রে এত মহিমা বলা আছে, একটি সাধারণ চাদরও আমাদের সেই শিক্ষাই দেয়। চাদর সর্বতোভাবে তার মালিকের শরণাগত থাকে, সতত তার অধীনে থাকে। তার মালিক তাকে যেমন ভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করে—তাকে কাঁধে ফেলে রাখে অথবা পা চাপা দেয়, অঙ্গে জড়িয়ে নেয় অথবা হুকে ঝুলিয়ে দেয় ; তাকে পাট করে বাক্সয় তুলে রাখে অথবা হেলায় মাটিতে ছুড়ে ফেলে দেয়, কাউকে দান করে দেয় অথবা বিক্রয় করে, জলে ডুবিয়ে দেয় অথবা কাদায় মাখামাখি করে, ছিঁড়ে ফালাফালা করে দেয় অথবা পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে—চাদর কিন্তু কোনো কিছুরই প্রতিবাদ করে না। এইভাবে চাদর আমাদের আত্মসমর্পণের শিক্ষা দান করে। তাই চাদরের মতন আমাদেরও সতত প্রভুর অনুকূল হওয়া উচিত। তিনি আমাদের যে অবস্থায় রাখেন তাতেই যেন সন্তুষ্ট থাকি ; তাঁর ইচ্ছায় নিজের ইচ্ছাকে বিলীন করে দিই, নিজ ব্যক্তিত্বকে ভুলে যাই, নিজ স্বতন্ত্র সত্তা হারিয়ে ফেলে যেন নিশ্চিন্ত থাকি। নিজের সর্বস্ব তাঁরই মনে করি—এমনকি ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ আর দেহ পর্যন্ত তাঁরই মনে করি। জীবন-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, স্তুতি-নিন্দা, ঐশ্বর্য-দরিদ্রতা সবই প্রভুর কৃপা মনে করে আপন করে নিই। ঐশ্বর্য লাভ করে উৎফুল্ল না হই আর প্রচণ্ড কষ্টেও যেন খেদোক্তি না করি। সংক্ষেপে আত্মসমর্পণের এই হল স্বরূপ।

চাদরের কাছ থেকে আমরা যোগেরও শিক্ষা লাভ করি। যোগের অর্থ চিত্তবৃত্তির নিরোধ—**'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'** (যোগদর্শন ১।২)। চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়ে গেলে আত্মা নিজ স্বরূপে স্থিত হয়ে যায়—**'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্'** (যোগদর্শন ১।৩)। চাদরকে যেমন যেখানে আমরা রেখে দিই, সে সেইখানেই অবস্থান করে, সেইখান থেকে

নড়া-চড়াও করে না। আমাদের চিত্তেরও অনুরূপ নিশ্চল স্থিতি নেওয়া উচিত। গীতাতে বলা আছে—

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥

(৬।১৯)

'বায়ুবর্জিতস্থানে প্রদীপ যেমন চঞ্চল হয় না, পরমাত্মার ধ্যানে সংযত-চিত্ত যোগীর অবস্থা তেমনই হয়ে থাকে।'

চাদরের কাছে আমরা জ্ঞানোপদেশও পাই। যে কোনো চাদরের কথাই ধরা হোক। উৎপত্তির পূর্বে তা ছিল না আর নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেও তা থাকবে না। এর থেকে প্রমাণ হয় যে মধ্যে স্থিতিকালেও তা নেই কেবল ভাসিত ; কারণ যার যথার্থ সত্তা আছে তার কোনো কালে অভাব হতে পারে না—এটি হল নিশ্চিত সিদ্ধান্ত। শ্রীভগবান গীতাতে বলেছেন—

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। (২।১৬)

যদি চাদরের প্রকৃতই সত্তা বা অস্তিত্ব থাকত কোনো কালে তার অভাব হত না। চাদরের অনস্তিত্ব হয়, তাই তা আসলে নেই। যখন তার অস্তিত্ব নেই তখন যে কালে তা আছে বলে মনে হয় সেই কালেও বস্তুত তার অভাবই থাকে, ভ্রমবশত তা আমাদের কাছে অস্তিত্বসম্পন্ন বলে মনে হয়। আমাদের দেহের অবস্থাও তাই। আমাদের দেহ জন্মের পূর্বে ছিল না আর মৃত্যুর পরেও থাকবে না। এতে প্রমাণ হয় যে যাকে আমরা জীবনকাল বলি সেই কালেও তা আদপেই নেই কেবল ভ্রমে প্রতীত হয়। যদি থাকত তাহলে এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তার অভাব কোনো কালে সম্ভব হত না। শ্রীভগবান গীতাতে বলেছেন—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥

(২।২৮)

'হে ভারত ! সমস্ত প্রাণী জন্মের পূর্বে অব্যক্ত ছিল, মৃত্যুর পরেও অব্যক্ত হবে কেবল মধ্যবর্তী কালেই ব্যক্ত ; তাই এই পরিস্থিতিতে শোক করা কেন ?'

যে বস্তু আদপেই নেই তার জন্য শোক কেন ?

এইভাবে দেহ তো বিনাশশীল। তাতে অবস্থানকারী আত্মা অজর ও অমর, দেহ নাশ হলেও তার বিনাশ হয় না, যেমন চাদর ছিঁড়ে গেলে চাদর ধারণকারী ব্যক্তির কিছু এসে যায় না। শ্রীভগবান জানিয়েছেন—

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি॥
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য ....
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

(গীতা ২।১৭-১৮, ২০)

'তাঁকেই অবিনাশী জানবে যাঁর দ্বারা এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। এই অবিনাশীর বিনাশ করতে কেউই সক্ষম নয়। অবিনশ্বর, অপ্রমেয়, নিত্যস্বরূপ জীবাত্মার এই সকল দেহকে বিনাশশীল বলা হয়। এই আত্মা কখনো জন্মান না বা মরেন না এবং আত্মার অস্তিত্ব উৎপত্তি সাপেক্ষ নয়, কারণ আত্মা জন্মরহিত, নিত্য, সনাতন এবং পুরাতন ; দেহ বিনষ্ট হলেও আত্মা বিনষ্ট হন না।'

দেহ অনিত্য এবং অসৎ আর আত্মা নিত্য এবং সৎ—এই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। এই জ্ঞান হলে মানব শোক বিরহিত হয়ে যায়। ভগবান গীতাতে বলেছেন—

গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ। (২।১১)

'যার প্রাণ থেকে বিয়োগ হয়ে গিয়েছে আর যার প্রাণ এখনো নির্গত হয়নি অর্থাৎ যে এখনও জীবিত—উভয়ের জন্য জ্ঞানীজন শোক করেন না। তাঁদের জীবন ও মৃত্যুতে সমদৃষ্টি থাকে। তাঁরা জানেন যে শাশ্বত নয় তার বিনাশ তো অবশ্যম্ভাবী কারণ বস্তু দৃষ্টিতে তা আদৌ নেই আর আত্মা কখনো মরে না, ত্রিকালেও তার বিনাশ হয় না। আত্মা সদা স্থির ভাবে অবস্থান করে।

বস্তুত আত্মা ছাড়া যা কিছু দেখা যায় তা মায়া-ভ্রম। এই জ্ঞানের নাম অদ্বৈত জ্ঞান। শ্রুতি ভগবতী বলেন যে এই অদ্বৈত তত্ত্বের জ্ঞান হয়ে গেলে শোক ও মোহের কোনো কারণই থাকে না, তা সর্বকালের জন্য বিনষ্ট হয়—**'তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ'** (ঈশ. ৭)। চাদরের কাছ থেকে এই অদ্বৈত জ্ঞানের শিক্ষা আমরা কীভাবে পেতে পারি তা বলা হল।

চাদর আমাদের কর্মের উপদেশও দেয়। চাদরের দ্বারা ত্বককে শীত-উষ্ণ আদি থেকে রক্ষ করা হয়। চাদর ঘ্রাণের কার্যে ব্যবহৃত হয় না, শ্রবণের নয়, স্বাদেরও নয়। তা কেবল গায়ে দেওয়ার ও পাতার কার্যে ব্যবহৃত হয়। এইভাবে এই নরদেহ অন্যের সেবার জন্য নির্মিত হয়েছে। সেবার কার্যেই নরদেহের সতত ব্যবহার হওয়া কাম্য। এর প্রয়োজন আলোয়ানের মতন সকলের উপকারেই নিহিত। মানব দেহই এমন এক দেহ যার দ্বারা দেবতা, মুনিঋষি, পিতৃপুরুষ এবং ভূত প্রেত থেকে আরম্ভ করে মানব, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ ও বনস্পতি পর্যন্ত সকলেরই সেবা করা সম্ভব হয়। পঞ্চ মহাযজ্ঞ এই সেবারই প্রতীক। এই জগতে আদান-প্রদান চলতেই থাকে। দেবতা থেকে শুরু করে পশু-পক্ষী এবং লতা-পাতা পর্যন্ত—সকলের দ্বারাই মানব জাতির কোনো না কোনো ভাবে সেবা হয়ে থাকে। এই সেবার প্রতিদানে মানবকেও অন্য সকল প্রাণীদের সেবা করা উচিত। শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ॥
কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।

তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥
এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥

(গীতা ৩।১০-১৬)

'প্রজাপতি ব্রহ্মা কল্পারম্ভে যজ্ঞসহ প্রজা সৃষ্টি করে বলেছিলেন যে তোমরা এই যজ্ঞের দ্বারা সমৃদ্ধ হও, এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট ফল প্রদান করুক। তোমরা এই যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদের সংবর্ধন করো এবং দেবতাগণও তোমাদের উন্নত করুন। এইরূপে নিঃস্বার্থভাবে পরস্পরের সংবর্ধনের দ্বারা তোমরা পরম কল্যাণ লাভ করবে। যজ্ঞের দ্বারা সংবর্ধিত হয়ে দেবতাগণ তোমাদের অভীষ্ট ভোগ্যসামগ্রী প্রদান করবেন। এইভাবে দেবতাদের প্রদত্ত ভোগ্যবস্তু যে ব্যক্তি দেবগণকে নিবেদন না করে স্বয়ং ভোগ করে, সে নিশ্চয়ই চোর। যজ্ঞাবশেষ অন্নের ভোক্তা শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ সর্বপাপ থেকে মুক্ত হন আর যে পাপাত্মাগণ নিজ শরীর পোষণের নিমিত্ত অন্নপাক করে তারা পাপই ভক্ষণ করে। সকল প্রাণী অন্ন হতেই উৎপন্ন হয়, অন্নের উৎপত্তি হয় বৃষ্টি হতে, বৃষ্টি হয় যজ্ঞ হতে এবং যজ্ঞের উৎপত্তি হয় বিহিত কর্ম হতে। কর্ম উৎপন্ন হয় বেদ হতে এবং বেদ অবিনাশী পরমাত্মা হতে উৎপন্ন বলে জানবে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সর্বব্যাপী পরমব্রহ্ম পরমাত্মা সর্বদাই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। হে পার্থ ! যে ব্যক্তি ইহলোকে এইরূপে পরম্পরাগতভাবে প্রচলিত সৃষ্টিচক্রের অনুবর্তন করে না অর্থাৎ নিজ কর্তব্য পালন করে না, সেই ইন্দ্রিয় সুখাসক্ত পাপী ব্যক্তি বৃথাই জীবনধারণ করে।'

যজ্ঞের ব্যাপক অর্থ হল সেবা। উল্লিখিত শ্লোকে যজ্ঞের নামে নিষ্কাম-সেবাকে জানানো হয়েছে। এইখানে 'দেবতা' শব্দকে সকল প্রাণীর উপলক্ষণ রূপে ধরা উচিত। দেবতা থেকে আরম্ভ করে জগতের সকল চরাচর জীব পর্যন্ত সকলেই কোনো না কোনো ভাবে মানুষের সেবা করে থাকে। অতএব মানুষের কর্তব্য হল প্রতিদানে সে যেন সকল চরাচর জীবের নিষ্কামভাবে সেবা করে ; দেবতাদের যজ্ঞ, হবন, আদির দ্বারা সন্তুষ্ট করা ; ঋষিদের স্বাধ্যায়রূপ জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা এবং জ্ঞানার্জন দ্বারা প্রসন্ন করা ;

পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধ-তর্পণ আদির দ্বারা তৃপ্ত করা ; মানবকে অন্ন-জল, বস্ত্র, আশ্রয়দান এবং অন্য প্রকারের সেবা দ্বারা সুখ প্রদান করা ; অন্য প্রাণীদেরও ভক্ষক না হয়ে রক্ষক হওয়া, তাদের আহার আদির যথোচিত ব্যবস্থা করা আর তাদের যথোচিত সুবিধা প্রদান করা ও বৃক্ষলতাকেও জল আদি দিয়ে রক্ষা করা, তাদের অনাবশ্যক ক্ষতি না করা। এইভাবে পরস্পরকে সেবা ও সুখ প্রদানে সচেষ্ট থাকলে সৃষ্টির চক্র যথাযথভাবে চালিত থাকে আর জগতের সকল জীব সুখী থাকে, কারো অনাবশ্যক কষ্ট হয় না। এই জগৎ বিশ্বজগৎপিতা পরমাত্মার বৃহৎ পরিবার। এটি তখনই সুখী থাকতে পারে যখন এই পরিবারের সকল অঙ্গ পরস্পরের সাহায্য করে পরস্পর সুখ প্রদান করে। যে তা করে না, অপরের সাহায্য গ্রহণ করে কিন্তু প্রতিদানে অপরের সেবা করে না, সে তো অপরাধী ও দণ্ড পাওয়ার যোগ্য। এই কথাই গীতার উল্লিখিত শ্লোকে বলা হয়েছে। আমাদের শাস্ত্রে বলিবৈশ্বদেব এবং তর্পণে দেবতা থেকে কীটপতঙ্গকে জল, অন্ন দেওয়ার বিধান আছে। এমনকি আমাদের সন্ধ্যা-গায়ত্রী আদি ঈশ্বরোপাসনাও বিশ্বকল্যাণের কথা ভেবে করতে বলা হয়েছে। এই ভেবে যে মানব নিষ্কামভাবে সকলের সেবা করে তার তো কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।

তা ছাড়া মানব হল ভগবানের সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী। সকল প্রাণী সৃষ্টি করে যখন বিধাতা সন্তোষ লাভ করলেন না তখন তিনি মানব প্রাণী সৃষ্টি করলেন। মানবকে ভগবান নিজের অনুরূপ করে তৈরি করেছেন। তাই প্রাণীদিগের রক্ষা, তাদের সেবা করে সুখ প্রদান করাই মানুষের পরম কর্তব্য। কিছু ব্যক্তি মনে করেন যে জগতের সকল প্রাণী মানুষের সেবা করবার জন্য সৃষ্ট, তাদের সুখ প্রদানের জন্যই তৈরি হয়েছে, তাই তারা তাদের যেমন ইচ্ছে ব্যবহার করতে পারে। মাংসভোজী জনগণ মনে করে যে (মানুষ ছাড়া) অন্যান্য জীবদের সৃষ্টি তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য, তাদের জিহ্বার সুখের জন্য হয়েছে। মানুষের এর চেয়ে বড় পতন আর কী হতে পারে ? মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব কি ইন্দ্রিয় তৃপ্তি দ্বারা নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ? তাহলে তো মানবকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী না বলে সর্বাধিক স্বার্থপর ও সর্বাপেক্ষা অধম প্রাণী বলাই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। যে যত স্বার্থপর তাকে ততই অধম বলা হবে।

মানব প্রাণীজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ তখনই হবে যখন সে সকলকে সুখ প্রদান করবার চেষ্টা করবে। আর জিহ্বার ক্ষণিক স্বাদ অথবা ক্ষুধা শান্ত করবার জন্য কোনো জীবের প্রতি হিংসা করা তো অতিশয় নৃশংস ও ঘৃণ্য কার্য। কোনো বুদ্ধিমান এবং বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি এটির সমর্থন করতে পারে না।

মানব-অঙ্গের সৃষ্টি দেখেও কেউ বলতে পারে না যে মানবকে প্রকৃতি মাংসভোজী রূপে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের কথা তো ছেড়েই দিই, অধম প্রাণীদের মধ্যেও হাতি, ঘোড়া, গর্দভ, মোষ, গোরু, বানর, হরিণ, ছাগল, ভেড়া, কপোতাদি অনেক এমন জীব আছে যারা গাছপালা ও অন্ন আদির দ্বারা জীবনধারণ করে আর ভুলেও মাংস ভক্ষণ করে না। মানুষের চাইতে নিম্নশ্রেণীর এমন বহু প্রাণী আছে যারা মাংসে ঘৃণা করে, এমতবস্থায় মানুষের সম্বন্ধে এই বলা যে, প্রকৃতি মানুষকে মাংসভোজীরূপে সৃষ্টি করেছেন তা বুদ্ধি বৈকল্য ছাড়া কী ? যথার্থ কথা হল—চাদরের উপকারিতা যেমন সেটি গায়ে দেওয়া ও বিছানোতে—ঘ্রাণ, শ্রবণ, স্বাদ গ্রহণের জন্য নয়, তেমনই মানব জীবনের সার্থকতা অপরের সেবা ও সুখ প্রদানের জন্য সেইগুলিকে বধ অথবা ভক্ষণ করায় নয়। অপরদিকে যাঁরা মানব জীবনের সার্থকতা অন্য প্রাণীদের উপর হিংসা করা বলে মনে করেন তাঁরা তো এই দেবদুর্লভ মানবজন্মের অসদ্ ব্যবহারই করেন। তারা আবার মানব জীবন পাবে না। তাদের মৃত্যুর পর কেমন দুর্গতি হয় তা শ্রীভগবান নিজ শ্রীমুখে বলেছেন—

> **তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।**
> **ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥**
> **আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।**
> **মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥**
>
> (গীতা ১৬।১৯-২০)

'সেই দ্বেষপরায়ণ, পাপাচারী, ক্রূর, নরাধমদের আমি এই সংসারে বারে বারে আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি। হে অর্জুন ! সেই মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে লাভ না করে জন্মে জন্মে আসুরী যোনি লাভ করে এবং ক্রমে তার থেকেও নিম্নগতি লাভ করে অর্থাৎ ঘোর নরকে পতিত হয়।'

মানবের উন্নতি এবং অবনতি তারই হাতে। তাই মানব যেন সতত নিজ কল্যাণের, আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা করে, জেনেশুনে নিজেকে অধোগতির গর্তে না ফেলে। শ্রীভগবান এও বলেছেন—**'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ'** (গীতা ৬।৫)। বিবেক-বিচারপূর্বক আচরণ করাই নিজেকে উন্নত করা এবং তার বিপরীত চেষ্টা করা নিজ মনুষ্যত্ব থেকে পতিত হওয়া, অধোগতিতে যাওয়া। স্বার্থত্যাগ করে অন্যের সেবা করাই মানবের বাস্তবিক কর্তব্য। যেমন গর্দভকে দেখে মনে এই ভাব উৎপন্ন হয় যে তা কোনো ভারবাহী পশু, সিংহের আকৃতি দেখে বোঝা যায় যে তা কোনো ক্রূর এবং হিংস্র জন্তু তেমনই মানবকে দেখে এই মনে হয় যে তার সৃষ্টি অপরের সেবার জন্য, সুখ প্রদান করবার জন্য। গোস্বামী তুলসীদাস পাপ ও পুণ্যকে সংক্ষেপে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

পর হিত সরিস ধর্ম নহিঁ ভাঈ। পর পীড়া সম নহিঁ অধমাঈ।।

একে নিম্নলিখিত সংস্কৃত পদ্যর ভাবানুবাদ বলা যেতে পারে—

অষ্টাদশপুরাণেষু ব্যাসস্য বচনদ্বয়ম্।
পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্।।

এটি সত্য যে ধর্মই আত্মার উন্নতি সাধন করে আর পাপ পতিত করে—পাতক করে। শ্রীভগবানও প্রাণীমাত্রের হিতে নিত্যযুক্ত থাকাকে তাঁর প্রাপ্তির উপায় বলে জানিয়েছেন—

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ।। (গীতা ১২।৪)

'সেই সর্বভূতের হিতাকাঙ্ক্ষায় নিত্যযুক্ত যোগী আমাকেই লাভ করে।' চাদরের কাছ থেকে এইভাবে সকলের সেবায় নিয়োজিত থাকার শিক্ষা লাভ হয়।

এইভাবে চাদর আমাদের বৈরাগ্য উপদেশও দেয়। চাদরের সতত একরকম রূপ থাকে না। স্বভাবত পরিণামী হওয়ায় তা প্রতিক্ষণ ক্ষীণ হতে থাকে আর ক্ষীণ হতে হতে একদিন সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। এই অবস্থা আমাদের দেহেরও হয়। তা প্রতিক্ষণ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ; একদিন এমন আসবে যে তা সতত শক্তিহীন এবং ক্রিয়াহীন হয়ে পড়বে আর মাটিতে মিশে যাবে। এই একই কথা জগতের সকল বিষয়-পদার্থ

—ভোগাদির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সংসারের সকল বিষয়-ভোগ মিথ্যা এবং দুঃখ স্বরূপ। আমরা ভ্রমবশত সেগুলিকে সত্য ও সুখরূপ বলে মনে করি। যদি সেগুলি সত্যই যথার্থ ও সুখরূপ হত তাহলে তো আমাদের সতত সুখ দানে সমর্থ হত। কিন্তু তেমন তো আমরা দেখি না। উদাহরণ হিসেবে দুধের কথা বলা যাক। তা দেখতে ভালো, সুস্বাদু, শক্তিবর্ধক ও সুখকর। কিন্তু যে স্বাদ ও গুণ টাটকা অথবা গরম করা দুধে পাওয়া যায় তা ঠাণ্ডা ও বাসি দুধে পাওয়া যায় না। দুই দিন পড়ে থাকলে তো তার স্বাদ সম্পূর্ণভাবে বদলে যায় আর তার গুণও নষ্ট হয়ে যায়। সেটিই দশ দিন পড়ে থাকলে বিষবৎ হয়ে যাবে ; তার নাম, রূপ, স্বাদ ও গুণ সব কিছুরই পরিবর্তন হয়ে যাবে। ন্যূনাধিক রূপে সকল বিষয়ের দশা এমনই হয়। পরিবর্তন ও বিনাশই জগতের রূপ।

প্রমাদ বা ভ্রমবশত জাগতিক বস্তুতে আমরা সুখের অনুভব করি। বস্তুত তা সবই দুঃখপ্রদ। উদাহরণরূপে পুষ্পমাল্য ধরা যাক। দুই চার বার ঘ্রাণ নিলে তা ভালো মনে হয় কিন্তু অনেকক্ষণ নাকে ধরে রাখা যায় না, কিছুক্ষণ পরেই তা সরিয়ে দিতে হয়। আর কেউ যদি তা জোর করে নাকে ধরে রাখে তাহলে আমরা বিরক্ত হই। আমাদের বিরক্তির কারণ কী ? যদি মালাতে সুখ থাকত তাহলে আমরা সতত তাকে নাকে চেপে রাখতাম অল্পক্ষণের জন্যও আলাদা করতাম না। কিন্তু আসল কথা তো তা নয়। বিষয়ে প্রমাদবশত আমাদের ক্ষণিক সুখের প্রতীতি হয়। পরিণামে তা দুঃখরূপই হয়। নারী প্রসঙ্গে পুরুষের দুঃখ লাভ তো প্রত্যক্ষ। তাতে একবার ক্ষণিকের জন্য সুখের প্রতীতি হয় অতঃপর কেবল গ্লানি, দুঃখ, বিরক্তি, ক্লান্তি, নির্বলতাই চোখে পড়ে এবং বল, বীর্য, তেজ ও বুদ্ধির নাশ ও স্বাস্থ্যের হানি—এতো স্পষ্টভাবে আমরা দেখতে পাই। এটির অত্যধিক ভোগ কিংবা নিষিদ্ধ সেবন করলে তো মানব রোগী ও স্বল্পজীবী হয় ; শীঘ্রই কালের অধীন হয়ে পড়ে আর পরলোকে দুর্গতি হয় ; তাই ভগবান গীতায় বলেছেন—

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্। (৯।৩৩)

'তাই তুমি সুখরহিত এবং ক্ষণভঙ্গুর এই মানবদেহ লাভ করে নিরন্তর আমারই ভজনা করো।'

এই মানবজীবন অনিত্য অর্থাৎ বিনাশশীল, এ প্রতিক্ষণ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কে জানে কবে তা খসে পড়বে। এই জীবন দুঃখরূপ, তাতে ভ্রমে সুখের প্রতীতি হয়ে থাকে। কিন্তু ক্ষণভঙ্গুর ও দুঃখরূপ হলেও তা অতিশয় পুণ্য বলে লাভ হয়। কেননা, নিত্য সুখরূপ ভগবানের প্রাপ্তি এই অনিত্য এবং দুঃখরূপ মানবদেহেই সম্ভব হয়। তাই এই দুর্লভ মানবদেহ লাভ করে যদি আমরা এই দেহ দিয়ে ঈশ্বর প্রাপ্তি রূপ স্থায়ী ও পরমলাভে ইচ্ছুক হই তাহলে তার একমাত্র উপায় হল—ভগবৎ শরণাগতি—যার স্বরূপ স্বয়ং ভগবানের কথায় এইরূপ—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।।

(৯।৩৪)

'তুমি মদ্‌গতচিত্ত হও, আমার ভজনশীল ও পূজনশীল হও। কায়মনোবাক্যে আমাকে প্রণাম করো। এইভাবে আত্মাকে আমার সঙ্গে যুক্ত করে মৎপরায়ণ হলে তুমি আমাকেই লাভ করবে।'

এইভাবে একটি সাধারণ চাদরের মাধ্যমে আমরা ভগবৎ শরণাগতি, যোগ, জ্ঞান, কর্ম এবং বৈরাগ্যের অনুপম শিক্ষা পেতে পারি। এভাবে আমরা চাইলে এই জগতের সমস্ত বস্তু থেকে অতি উত্তম শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। কোনো এক কবি কী সুন্দর কথাই না বলেছেন !

উত্তম বিদ্যা লীজিএ জদপি নীচ পৈ হোয়।
পর্‍্যৌ অপাবন ঠৌর মহঁ কঞ্চন তজৈ ন কোয়।।

———০———

সতর্কবার্তা

বহুত গঈ থোরী রহী, নারায়ন! অব চেত।
কাল চিরৈয়া চুগ রহী, নিসিদিন আয়ূ খেত॥
কাল করৈ সো আজ কর, আজ করৈ সো অব।
পলমেঁ পরলৈ হোয়গী, বহুরি করৈগো কব॥
কবিরা নৌবত আপনী, দিন দস লেহু বজায়।
য়হ পুর পট্টন য়হ গলী, বহুরি ন দেখৌ আয়॥
চলতী চাকী দেখ কৈ, দিয়া কবীরা রোয়।
দো পাটন বিচ আয় কৈ, সাবিত বচা না কোয়॥
দো বাতন কূঁ য়াদ রখ, জো চাহৈ কল্যান।
নারায়ন এক মৌত কূঁ, দূজে শ্রীভগবান॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥ (৯।৩৩)

'অতএব তুমি এই সুখহীন, ক্ষণভঙ্গুর, মনুষ্যদেহ ধারণ করে সতত আমারই ভজনা করো।'

এই মানবজীবন ক্ষণভঙ্গুর ও দুঃখরূপ। আজ যাকে আমরা সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান দেখি কালই শুনি যে হঠাৎ হৃদয়ের গতি রুদ্ধ হয়ে তার জীবনলীলা সাঙ্গ হয়েছে। আমরা জীবনে অনেক কামনা করি, আকাশ-কুসুম কল্পনা করি কিন্তু মৃত্যুর নির্দয় হস্ত হঠাৎ এসে আমাদের স্বপ্নরাজ্য ধূলিসাৎ করে দেয় আর আমাদের কল্পনা যথাবৎ পড়ে থাকে। জীবনের চেয়ে মৃত্যুই অধিক নিশ্চিত। আমরা কত দিন বাঁচব এ কেউ বলতে পারে না ; কিন্তু মৃত্যু নিশ্চিতই। যে জন্মগ্রহণ করেছে সে তো মরবেই। জনৈক কবির কথায়—

নৌ দ্বারে কা পীঁজরা, তামেঁ পঞ্ছী পৌন।
রহনেকো আচরজ হৈ, গএ অচম্ভা কৌন॥

শ্বাস-প্রশ্বাস থাকবে, কী থাকবে না! এতে কোনো স্থিরতা নেই। একটু

জ্বর হল, ন্যুমোনিয়া হয়ে গেল, সংসার থেকে চলে গেল। একটা ফোঁড়া হল বিষিয়ে গেল আর সেই বিষ দেহে ছড়িয়ে আমাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে গেল। আবালবৃদ্ধ সকলেরই এক অবস্থা। বৃদ্ধরা তো তবুও রোগের আক্রমণে কিছু দিন সহ্য করতে পারে। আজকালের যুবকদের তো এমন অবস্থা যে দশ দিনের জ্বর হল আর শেষ হয়ে গেল। এমন সব মৃত্যুর কথা দেখি ও শুনি যা দেখে বা শুনে বুক কেঁপে ওঠে। কারো ছয় মাস পূর্বে বিবাহ হয়েছিল, কেউ নিজ বৃদ্ধ মা-বাপের একমাত্র সন্তান, চোখের মণিসম ছিল, তাদের জীবনের একমাত্র সম্বল ছিল, সেও হঠাৎ চলে গেল। আর এখন তো মৃত্যু আরও সহজ হয়ে গিয়েছে। কোথাও বন্যা হল আর গ্রামের পর গ্রাম একসঙ্গে ভেসে গেল। লোকেরা শুয়েই রয়ে গেল। একটি ভূমিকম্প হল আর তাতেই পুরো শহর ধ্বংস হয়ে গেল। শহরে কলেরা হল, প্রতিদিন শত শত লোক মরতে লাগল। কখনো রণচণ্ডী ভয়ংকর রূপ ধরে লাখ লাখ মানুষ সংহার করছে আর কখনো প্রতিদিন হাজার হাজার নর-নারী ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করে মরছে। যাতে আমাদের এত গর্ব যার অহংকারে আমরা অন্যকে ধর্তব্যের মধ্যে আনি না, পুরুষানুক্রমে বাঁচবার ব্যবস্থা করি, আমাদের সেই জীবনের এই হাল ! তবুও আমাদের চৈতন্য হয় না, ক্ষণিক বিষয় সুখের পিছনে এই অমূল্য জীবনকে—যাকে শাস্ত্র দেবদুর্লভ বলেছেন, ব্যর্থই নষ্ট করে দিই। আমাদের এক-একটি নিঃশ্বাস এত অমূল্য যে তা আমরা লাখ টাকা দিয়েও কিনতে পারি না। এমন অমূল্য নিধিকে আমরা আলস্য-প্রমাদ, আনন্দ, হাসি-ঠাট্টা, আরাম ও ভোগ বিলাসে নষ্ট করছি। যেন হিরেকে কড়ির দামে বেচে দিচ্ছি। এর চেয়ে মূর্খতা আর কী হবে ?

এই জীবন কেবল অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুরই নয় দুঃখরূপও বটে। আমরা যেদিকে তাকাই কেবল দুঃখই দেখতে পাই। বাল্যকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দুঃখেরই আধিপত্য। জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি আমাদের চার দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। জন্মে দুঃখ, মৃত্যুতে দুঃখ, জরায় দুঃখ ও ব্যাধিতে তো দুঃখ আছেই। জন্ম হলে, বলা যাক মাতৃগর্ভে আসা মাত্রই এই জীবকে দুঃখ চার দিক থেকে ঘিরে ফেলে। মাতৃগর্ভে থাকাকালে জীব ঘোর কষ্ট অনুভব করে। সে চার দিকে মাংস-মজ্জা, রুধির-কফ ও মল-মূত্র আদি দূষিত দুর্গন্ধযুক্ত

পদার্থে ঘেরা থাকে, নড়াচড়া করতে পারে না। উপরদিকে পা ও নীচে মাথা করে কুঁকড়ে পড়ে থাকে। সুখে নিঃশ্বাসও নিতে পারে না। নানারকম কৃমি ও কীট তার কোমল চামড়াকে উত্যক্ত করতে থাকে। মাতা যদি ভুলেও কোনো ক্ষারযুক্ত অথবা দহনকারী বস্তু খেয়ে নেয় তাহলে গর্ভের শিশুর ত্বক জ্বালা করতে শুরু করে। সে নিরুপায়ভাবে সব দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে, কেউ তার সাহায্য করতে পারে না। উপরন্তু তাকে পূর্বজন্মের স্মৃতিও উত্যক্ত করতে থাকে। এইভাবে সে অতি কষ্টে গর্ভ জীবন কাটায়। গর্ভ থেকে বার হওয়ার সময়ে তাকে গভীর যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়, কষ্টে সে অচৈতন্য হয়ে যায়। অনেক শিশুই সেই কষ্ট সহ্য করতে না পেরে প্রাণ ত্যাগ করে। মৃত্যুর সময়ে মানুষের যে ভয়ংকর কষ্ট হয় তা আমরা ভালোভাবেই জানি। তখন তার কেমন অসহায় অবস্থা হয়ে যায়, দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে নৈরাশ্য প্রতিফলিত হতে থাকে। সে বহু কষ্টে প্রাণ ত্যাগ করে। যে গৃহ, জমি, স্ত্রী-পুত্র, ধনসম্পদকে সে মমতায় প্রতিপালন করেছিল, নিজের জীবনের থেকেও বড় ভেবেছিল আর যাদের রক্ষা করবার জন্য বহু কষ্ট সহ্য করেছিল , লোক-পরলোকের পরোয়া করেনি, যার জন্য সে কত লোককে কষ্ট দিয়েছে, কত লোকের প্রাপ্য দেয়নি, কত লোকের সঙ্গে শত্রুতা করেছে, মামলা করেছে—সেই সবকে বাধ্য হয়ে ত্যাগ করতে তার কত কষ্ট অনুভব হয়—তা মৃত্যুপথযাত্রীই জানে। আমরা সকলেই সেই কষ্ট পূর্বজন্মে ভোগ করেছি আর যত দিন না এই জীবন শেষ হয় আমাদের অধিকাংশকেই তা আবার ভোগ করতে হবে। বৃদ্ধ বয়সের দুঃখও আমাদের অজানা নয়। বৃদ্ধাবস্থায় ইন্দ্রিয়সকল শিথিল হয়ে পড়ে, দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে যায়, দাঁত নড়বড়ে হয়ে যায়, কানে ভালো করে শোনাও যায় না, চামড়া কুঁচকে যায়, সাহায্য ছাড়া চলাও কঠিন হয়, আপনজনেরা অবজ্ঞা করে, বুদ্ধি বৈকল্যও দেখা যায় আর নানারকম চিন্তা ঘিরে ধরে। ব্যাধির কথা অল্পবিস্তর আমরা সকলেই জানি। আমাদের শাস্ত্রকারগণ এই দেহকে ব্যাধির বাসস্থান বলেছেন —'শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্'। ভগবৎ-অবতার আর কারক-পুরুষ ছাড়া প্রায় সকলকেই অল্পবিস্তর ব্যাধির শিকার হতে হয়। বড় বড় মহাপুরুষ ও লোকোপকারী ব্যক্তিগণও ব্যাধি থেকে রেহাই পান না। স্বাস্থ্যবান ও বলবান

ব্যক্তিও একদিন এর সামনে মাথা নত করে। এইভাবে আমরা দেখি যে জীবনের চারদিকে কেবল দুঃখেরই আধিপত্য। যাকে আমরা সুখ বলি তাও দুঃখ মিশ্রিত, পরিণামে দুঃখপ্রদ এবং বস্তুত দুঃখরূপই[১]। বিচ্ছেদ তো সকলের সঙ্গে লেগেই আছে। যে বস্তুর প্রাপ্তিতে আমরা সুখানুভূতি লাভ করি, তাই বিয়োগ হলে দুঃখের কারণ হয়ে যায়। স্ত্রী-পুত্র, ধন-মান পদ প্রতিষ্ঠা, সুখভোগ—সবই এমনই। এক ধনসম্পদকেই ধরে নিন। তা উপার্জন করতে কষ্ট হয়, রক্ষা করতে কষ্ট করতে হয় আর তা অনিচ্ছায় ত্যাগ—খরচ করতেও কষ্ট হয় আর তার বিনাশ হলে—চলে গেলেও কষ্ট হয়। যদি সরকার তা কেড়ে নেন, জরিমানারূপে নিয়ে যান, চোর চুরি করে, অগ্নিতে ভস্ম হয়, জলে ভেসে যায় অথবা তাকে সুরক্ষিত দশায় ছেড়ে আমাদের পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়—প্রত্যেক পরিস্থিতিতে আমাদের অতিশয় দুঃখ হয়ে থাকে।

এখন প্রশ্ন হল যে এই দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় কী ? শাস্ত্র অনুসারে স্বেচ্ছায় বিষয় ত্যাগ করলে সুখ হয়। ভোগবুদ্ধিতে বিষয়-সংগ্রহ দুঃখের মূল। আমরা ভ্রমবশত বিষয়কে সুখ বলে মনে করি। বস্তুত যার কাছে যত বেশি বিষয় সংগ্রহ আছে সে ততই দুঃখী এবং যে যত অপরিগ্রতে

---

[১]মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন—

পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ।

(২।১৫)

অর্থাৎ (১) প্রতিটি সুখের পরিণাম হয় দুঃখ। (২) এছাড়াও প্রতিটি সুখভোগে তারতম্য থাকে। এমতবস্থায় অধিক সুখভোগকারীকে দেখে স্বল্প সুখভোগকারীর ঈর্ষা হয় এবং ঈর্ষা হওয়ার অর্থ হল দুঃখ। (৩) সুখভোগের পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত হওয়ার পর সেগুলি না থাকলে তাঁর স্মৃতি খুবই যন্ত্রণা দেয়—বারে বারে পূর্ব অবস্থার কথা মনে করে মানুষ নীরবে কাঁদতে থাকে। (৪) কোনো সুখই সর্বতোভাবে দুঃখশূন্য নয়, প্রতিটি সুখে দুঃখ অবশ্যই মিশে থাকে। (৫) এছাড়াও সুখী মানুষও সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসিক বৃত্তির পারস্পরিক সংঘর্ষে দুঃখী থাকে। এই পাঁচটি কারণে বিবেকবান ব্যক্তি জাগতিক সবকিছুকেই দুঃখরূপ বলে মনে করে।

(সঞ্চয় না করাতে) বিশ্বাস করে সে ততই সুখী হয়। ধন-সম্পদের তিন গতি হয়—দান, ভোগ, নাশ। আমাদের শাস্ত্র দানকেই সর্বশ্রেষ্ঠ গতি বলেছে এবং তাই হল ধনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপযোগ। ধনের রক্ষারও সর্বোত্তম উপায় হল দান। সেই ধন-সম্পদই সুরক্ষিত যা আমরা অপরের সেবায়, ভগবানের সেবায় ব্যবহার করি। ধন-সম্পদের নাশ এক না এক দিন অবশ্যম্ভাবী। তা আমরা ভোগ নিমিত্ত ব্যয় করে দিতে পারি অথবা অন্য কেউ সেটি হস্তগত করে নেয় বা সরকার কর রূপে আদায় করে কিংবা আমরাই তা ছেড়ে পৃথিবী থেকে চলে যাই ! প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমাদের সঙ্গে তার বিয়োগ হবেই। তাকে অক্ষয় করে রাখতে—স্থায়ী করার একমাত্র উপায় এই যে তা ভগবানের সেবায়—জনগণের সেবায় অথবা দরিদ্র নারায়ণের সেবায় লাগাতে হবে। প্রকৃত সত্য এই যে আমাদের সকল সম্পদ ভগবানের। লক্ষ্মীদেবী, যাঁকে আমরা ধন-সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে জানি—তাঁর অর্ধাঙ্গিনী, ভগবানের চরণ সেবিকা। তাঁরও অধিক সুখ ভগবানের চরণ প্রান্তেই লাভ হয়ে থাকে। তাই তিনি ভগবানের পাদপদ্ম ছেড়ে অন্যত্র যেতে চান না, তাঁর সঙ্গেই নিত্যযুক্ত থাকেন। এই অবস্থায় প্রতিটি ধনী ব্যক্তির কর্তব্য এই হয় যে তাঁকে মাতা মনে করে ভগবানের চরণেই নিত্যযুক্ত করা আর তাঁর প্রসাদরূপেই জীবন-যাপনের দৃষ্টিতে বিষয়ের সেবন করা। ভগবানের বস্তুকে ভগবানের সেবায় অর্পণ না করে যে তা ভোগ করে সে তো অপরাধী, দণ্ড পাওয়ার যোগ্য, পঞ্চ মহাযজ্ঞের অভিপ্রায়ও তাই। ভগবান গীতায় বলেছেন—

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥

(৩।১৩)

'যজ্ঞাবশেষ অন্নের ভোক্তা শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ সর্বপাপ হতে মুক্ত হন আর যে পাপাত্মাগণ নিজ শরীর পোষণের নিমিত্ত অনুপাক করে তারা তো পাপই ভক্ষণ করে।'

এমন ব্যক্তিদেরই ভগবান পরবর্তী শ্লোকে অঘায়ু-পাপজীবী বলেছেন এবং তাদের জগতে বেঁচে থাকা ব্যর্থ বলে জানিয়েছে—**'অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো**

মোঘং পার্থ স জীবতি' (৩।১৬)। শ্রুতি ভগবতীও বলেন—'**কেবলাঘী ভবতি কেবলাদী।**'

কিন্তু যদি এমন করা সম্ভব না হয়, আমরা সব কিছু ভগবানের মনে করতে না পারি তাহলে অন্তত নিজ আয়ের ষষ্ঠাংশ তো অবশ্যই ভগবানের সেবায়—ধর্মকার্যে ব্যয় করা উচিত। এটি আমরা করতে পারি। ধর্মকে শাস্ত্র পঙ্গু বলেছেন—তা আমাদের চেষ্টাতেই গতিশীল হয়। সরকারের মতন তা আমাদের কাছ থেকে জোর করে কর আদায় করে না। আমরা তো ভোগের জন্য অর্থ জলের মতন খরচ করি, বিবাহাদিতে ও অন্যান্য সামাজিক কার্যে অনর্থক খরচ করি, কীর্তির জন্য অথবা উপাধি আদি রূপে সরকারকে খুশি করার জন্য বড় বড় চাঁদা দিয়ে থাকি ও সরকারি আমলাদের খুশি করতে বড়সড় আয়োজন করি। এমন না করে নিজ আয়ের অথবা সম্পত্তির অন্তত ষষ্ঠাংশ সমাজের উপকারের কার্যে খরচ করা উচিত, নিজ ব্যবসার অনেকগুলি ভাগের মধ্যে একটা ভাগকে অথবা একটি মাত্র ব্যবসায় থাকলে তার আয়ের এক অংশকে লোকসেবক ট্রাস্ট হিসেবে পরিবর্তিত করা উচিত যাতে তার সমস্ত আয় পরোপকারে খরচ করা যায় আর তার উপর নিজের স্বত্ব যেন একটুও না থাকে। বলাই বাহুল্য যে এমন কার্য করলে প্রশাসনও আমাদের উৎসাহ দিয়ে থাকেন। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে ধর্ম সম্বন্ধযুক্ত ও লোকোপকার আয়ের উপর সরকারও আয়কর নেন না। আজ আয়কর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের বহু ব্যবসায়ী ছলনা ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। এইভাবে অন্যায় পথে যে লাখ লাখ টাকা বাঁচানো হয় তা না করে লোক উপকারে ট্রাস্ট তৈরি করে সেই সম্পদকে লোক উপকারেই ব্যয় করুন। নিজের স্বার্থে তা ব্যবহার করবেন না। এইভাবে লোক-উপকার কার্যে যা কিছু ব্যয় করা হবে তাতো অক্ষয় হয়ে থাকবে। আমরা ভোগ বুদ্ধিতে যা কিছু সঞ্চয় করি তা আমাদের মৃত্যুর পর এইখানেই পড়ে থাকবে তার কিছুই আমাদের সঙ্গে যাবে না, একটা ছুঁচের উপরও আমাদের অধিকার থাকবে না। কিন্তু ধর্মের জন্য আমরা যা কিছু খরচ করব তা আমরা পরলোকেও পাব। যদি আমরা কোনো ফল কামনায় এমন করি তাহলে মৃত্যুর পর স্বর্গাদিলোক লাভ হবে, যেখানকার সুখ এখান থেকে অনেক গুণ

বেশি। আর যদি আমরা ভগবৎ সেবার জন্য অর্থাৎ ভগবানকে অর্পণ করবার জন্য বা নিষ্কামভাবে লোক উপকারী কার্যে সম্পদ ব্যয় করি তাহলে তা আমাদের কল্যাণের পথ প্রসস্ত করবে—আমরা জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে ভগবানে বিলীন হয়ে যাব অথবা ভগবানের পরমধামে চলে যাব যেখানে অক্ষয় সুখ বর্তমান, সেখানে লেশমাত্রও দুঃখ নেই। গীতাতেও ভগবান বলেছেন—'**স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ**' (২।৪০)। ধর্ম নিমিত্ত যা কিছু নিষ্কামভাবে ব্যয় করা হয় তা অক্ষয় হয়ে যায়—তা চোর চুরি করতে পারে না, ডাকাত কেড়ে নিতে পারে না, সরকার নিয়ে নিতে পারে না আর অন্যায়কারী অধিকার করে নিতে পারে না। কিন্তু আমরা অজ্ঞানী জীব চুরি, ডাকাতি, রাজদণ্ড, অগ্নি আদির উপদ্রব সব কিছু সহ্য করে নিই কিন্তু স্বেচ্ছায় ধর্মের বিধান মেনে নিই না। কেউ বলেছেন—

অগিন পলীতা রাজদণ্ড, চোর মূস ধন খায়।
ইতনা তো দণ্ড নর সহৈ, হরিদণ্ড সহা ন জায়।।

দান করবার জন্য এমনিতে অনেক পথ খোলা আছে কিন্তু এই সময়ে সব থেকে বেশি দরকার আমাদের দেশে ক্ষুধার্তকে অন্ন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, রুগীকে ঔষধি, জিজ্ঞাসু ও ছাত্রদের গীতা রামায়ণ আদি শিক্ষামূলক সদ্‌গ্রন্থ বিতরণ দ্বারা সাহায্য করা আর খাদ্য দ্বারা গো-ধন রক্ষা করা। আজ দেশের বহু ভাগে অন্নের কষ্ট দেখা যাচ্ছে। অন্নের জন্য চতুর্দিকে হাহাকার। প্রতিদিন আমাদের চোখের সামনেই হাজার হাজার আমাদের মতন ভাই-বোন ও বালক ক্ষুধায় মারা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, কোথাও শেয়াল কুকুর তাদের জীবিত অবস্থায় ছিঁড়ে খাচ্ছে আর তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারছে না। ক্ষুধার তাড়নায় লোকেরা আত্মহত্যা করছে। মায়েরা বাচ্চাদের ত্যাগ করছে। বহু স্থানে ক্ষুধার জ্বালায় লোকেরা নিজ কন্যাদের বিক্রয় করে দিচ্ছে। কলকাতা আদি শহরের রাস্তায় লোকে কাতরাচ্ছে। শক্তিহীন হয়ে তারা নড়াচড়াও করতে পারে না।[২] এই করুণ দৃশ্য দেখে পাথরের মতন কঠিন হৃদয়ও বিগলিত হয়। আমাদের নারীদের কাছে লজ্জা নিবারণের বস্ত্র নেই

[২]বাংলার ঘোর দুর্ভিক্ষের সময়ে এটি লেখা হয়েছিল।

এবং ক্ষুধায় কাতর নর-নারী রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এই সময় আমাদের ধনী ভাইদের সব থেকে বড় কর্তব্য মুক্তহস্তে দুঃখী গরিব ভাই-বোনদের সাহায্য করা, তাদের মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা করা, অন্নহীনকে অন্ন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, রুগীকে ঔষধি ও ছাত্রদের জন্য বিদ্যা দানের ব্যবস্থা করা আর যারা দান নিতে চায় না তাদের জন্য স্বল্প মূল্যে খাদ্য-শস্য বিতরণের ব্যবস্থা করা।

এসময়ে আমাদের দেশে গো-জাতির উপর বিশাল সংকট উপস্থিত হয়েছে। প্রতিদিন হাজার হাজার দুগ্ধবতী গাভী, বাছুর ও বলদ আমাদের সামনেই বধ করা হচ্ছে আর আমরা তা দেখেও কিছু প্রতিকার করতে পারছি না। ধেনুসকল খাদ্যের অভাবে প্রাণ দিচ্ছে। আমাদের কর্তব্য যে আমরা তাদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করি আর তাদের সংখ্যার অবনতি রোধ করি। গোধন আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ, তাতে আমাদের ধর্মকর্ম সম্পন্ন হয় ও আমাদের দেহের পুষ্টি হয়। গোরু-বলদ ছাড়া আমাদের জীবনও কঠিন হয়ে যাবে। এমন দশায় প্রত্যেক ভারতবাসীর এই কর্তব্য যে গোরক্ষা হেতু শরীর মন ও সম্পদ দ্বারা এগিয়ে আসা। প্রতিটি ভারতীয় গৃহস্থের উচিত যে সে কষ্ট সহ্য করেও অন্তত একটা গাভী গৃহে পালন করে। যখন ধেনুর প্রাচুর্য ছিল তখন আমাদের ভারতবর্ষ সুখ-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ ছিল। এইখানে দুগ্ধ-দধির স্রোত বইত। যে শুদ্ধ মাখন ও ঘৃত দেখাও দুর্লভ তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে বানরদেরও খাওয়াতেন। কেবল নন্দবাবার গৃহে নয়লক্ষ গাভী ছিল আর এক একজন রাজা লাখে লাখে ধেনু দান করতেন। আজ আমাদের গোসম্পদের যে অবনতি দেখা যাচ্ছে তা আমাদের প্রমাদের কারণেই হচ্ছে। আমাদের এখনই চৈতন্য উদয় হোক আর আমরা যেন তা নিবারণে সচেষ্ট হই।

প্রাচীনকালে লোকেরা গো-রক্ষার জন্য অতিবড় কষ্ট সহ্য করবার জন্য তৈরি থাকতেন। গো-রক্ষার জন্য তাঁরা নিজ প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে দ্বিধা করতেন না। মহারাজ দিলীপের গোভক্তি ও অর্জুনের গোরক্ষা ব্রত এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রাজা দিলীপ চক্রবর্তী সম্রাট ছিলেন। গুরু বশিষ্ঠদেবের আদেশে তিনি তাঁর গোরু নন্দিনীর সেবার ভার নিজে নিয়েছিলেন। এত বড় সম্রাট হলেও গো-সেবায় তাঁর কোনো দ্বিধা ছিল না। তিনি তা চরাতে জঙ্গলে নিয়ে

যেতেন এবং নন্দিনীকে ইষ্টদেবীসম সেবা করতেন। তিনি তার বসায় বসতেন, দাঁড়ালে দাঁড়াতেন, গাভী খাদ্য গ্রহণ করলে নিজে খাদ্য গ্রহণ করতেন এবং গাভী জলপান করলে তখন তিনি জলপান করতেন। একদিন নন্দিনী সবুজ ঘাসে সুশোভিত হিমালয়ের কন্দরে প্রবেশ করে গেল। তার চিত্তে একটুও ভয় ছিল না। রাজা দিলীপ হিমালয়ের অনন্ত শোভা দর্শন করছিলেন। এরই মধ্যে একটি সিংহ এসে নন্দিনীকে জোর করে ধরে ফেলল। সিংহ আসবার কথা রাজা দিলীপ জানতেই পারলেন না। সিংহের কবলে পড়ে নন্দিনী আর্তনাদ করে উঠল। এইবার রাজার দৃষ্টি নন্দিনীর উপর পড়ল এবং তিনি নন্দিনীর আর্তনাদের কারণ জানতে পারলেন। তিনি দেখলেন যে গাভীর মুখ অশ্রুতে শিক্ত হয়ে আছে আর এক ভয়ংকর সিংহ তাকে চেপে ধরেছে। এই দৃশ্য দেখে রাজা ব্যথিত হলেন। তিনি সিংহের কবলে পড়া নন্দিনীকে আবার দেখলেন এবং তূণ থেকে বাণ নিয়ে ধনুকে যুক্ত করলেন আর সিংহকে বধের জন্য জ্যা আকর্ষণ করলেন। তখনই সিংহ রাজার দিকে তাকাল। তার দৃষ্টি পড়তেই রাজার শরীর হিম হয়ে গেল। তাঁর শর নিক্ষেপের শক্তি চলে গেল। তিনি খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন। যখন রাজা দেখলেন যে কোনো উপায়েই গাভী রক্ষা করা সম্ভব নয় তখন তিনি স্বয়ং সিংহের কাছে গিয়ে বললেন—'তুই ওকে ছেড়ে দে আর তার বদলে আমার মাংসে ক্ষুধা নিবারণ কর।' সেই সিংহ ছিল আসলে নন্দিনীর মায়া, রাজাকে পরীক্ষা করবার জন্যেই সে এমন মায়া রচনা করেছিল। রাজার এই অনুপম ত্যাগ দেখে নন্দিনী প্রসন্ন হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে রাজা দেখলেন যে কোথাও কেউ নেই, একা নন্দিনী আনন্দে ঘাস খাচ্ছে।

অর্জুনের গো-রক্ষার কথাও সুপ্রসিদ্ধ। দ্রৌপদী সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদের কথায় পাণ্ডবদের মধ্যে ঠিক করা হয়েছিল যে দ্রৌপদী এক এক করে পঞ্চ পাণ্ডবের সঙ্গে থাকবেন এবং এক ভ্রাতার কাছে একান্তে থাকবার সময়ে যদি অন্য কোনো ভ্রাতা তার ঘরে চলে যায় তাহলে তার বারো বৎসর ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করে বনে বাস করতে হবে। একসময়ে কিছু ছিনতাইকারী এক ব্রাহ্মণের গাভী চুরি করে পালাচ্ছিল। ব্রাহ্মণ এসে অর্জুনের সাহায্য চাইলেন। অর্জুনের ধনুর্বাণ তখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ঘরে রাখা ছিল আর

তখন দেবী দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে একান্তে ছিলেন। অর্জুন ধর্মসংকটে পড়ে গেলেন। যদি তিনি শস্ত্র নেওয়ার জন্য যুধিষ্ঠিরের ঘরে যান তাহলে নিয়মভঙ্গ হবে যার দণ্ডরূপে তাঁকে বারো বৎসর বনবাসে যেতে হবে ; আর যদি ধনুর্বাণ না আনেন তাহলে ব্রাহ্মণের গো-রক্ষা হবে না। অতঃপর বিবেচনা করে তিনি ঠিক করলেন যে নিয়মভঙ্গ করে কঠোর শাস্তি ভোগ করেও তাঁর অবশ্যই গোরক্ষা করা উচিত। তাই তিনি সোজা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ঘরে গিয়ে ধনুর্বাণ নিয়ে এলেন। লুণ্ঠনকারীর হাত থেকে গাভী রক্ষা করে তিনি ব্রাহ্মণকে দিয়ে দিলেন আর তারপর মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে নিয়মভঙ্গ করবার জন্য বারো বৎসর অরণ্যবাসের অনুমতি চাইলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির বোঝালেও তিনি মানলেন না এবং বনবাসের উদ্দেশ্যে গমন করলেন। এইভাবে কঠোর দণ্ড ভোগ করেও তিনি গোরক্ষা ব্রত পালন করলেন। যতদিন আমরা ভারতবাসীরূপে গোমাতার জন্য এইভাবে প্রাণ দেওয়া ও কষ্ট পাওয়ার জন্য তৈরি ছিলাম ততদিনই আমরা প্রকৃত গোরক্ষকরূপ নিজেদের পরিচয়ের অধিকারী ছিলাম। আজকাল তো আমরা গোরক্ষার ফাঁকা বুলি আওড়াই।

গোরক্ষার জন্য প্রয়োজন হল আমরা যেন গোজাতির প্রতি আমাদের কর্তব্য বুঝবার চেষ্টা করি। তাদের যাতে খাদ্য পাওয়া সহজ হয় তাই আরও গোচারণ ভূমির ব্যবস্থা করতে হবে। গাভী, বাছুর ও বলদ যাতে ঘাতকের হাতে যেতে না পারে তার জন্য প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করা। গোমাতার প্রতিপালন ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য মনোযোগ দেওয়া। বৃদ্ধা, অকেজো গাভী ও বাছুরদেরও রক্ষা করবার ব্যবস্থা করা আর উত্তম গোজাতির প্রজননের ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। এর জন্য অর্থের সঙ্গে উৎসাহ ও উদ্যমেরও প্রয়োজন হয়। আমাদের ধনী ভাইয়েরা ধনের মাধ্যমে সাহায্য করুক। বৈশ্যদের জন্য গোরক্ষা এক মুখ্য ব্যবসা ও ধর্ম বলা হয়। ভগবানও গীতায় বলেছেন—

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্মং স্বভাবজম্। (১৮।৪৪)

'কৃষি, গোপালন ও বাণিজ্য হল বৈশ্যর স্বাভাবিক কর্ম।' কাল বিপর্যয়ে কৃষি ও গোপালন—এই দুই কর্ম বৈশ্য জাতি প্রায় ত্যাগ করেছে। এখন বাণিজ্যই তাদের জীবিকার প্রধান পথ হয়ে আছে। ধার্মিক দৃষ্টিতেও আমাদের

বৈশ্য ভ্রাতাদের কাছে নিবেদন যে বাণিজ্যসম তারা কৃষি ও গোপালন ব্যবসাকেও যেন গ্রহণ করে যাতে এদেরও উন্নতি হয়। আমাদের নগরের জনগণ বিশুদ্ধ দুগ্ধ আদি গব্যজাত দ্রব্যাদি যাতে অনায়াসে পায় তার জন্য ডেয়ারি ফার্মের বিশেষভাবে ব্যবস্থা করা উচিত। ধার্মিক দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায় দৃষ্টিতে যখন আমরা গোপালন কার্যে নিয়োজিত হব তখনই গোরক্ষা ও তাদের বৃদ্ধি সম্ভব হবে। গোসম্পদ তো আমাদের প্রধান সম্পদ ছিল। পূর্বে যার যত গোসম্পদ থাকত তাকে তত বিত্তশালী ধরা হত। আমাদের দেশে ভূমি ও গোসম্পদই উৎপাদনের প্রধান পথ বলা হয়েছে। ভূমি ও গোসম্পদের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধও আছে। গোজাতির প্রতিপালন ভূমি ছাড়া হওয়া সম্ভব নয়। গোচারণ ভূমির অবক্ষয় এখন গোজাতির সংখ্যায় অবনতির প্রধান কারণ। এইভাবেই গোজাতির সাহায্য ছাড়া ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি হয় না। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগেও গোবরসম অন্য কোনো সার এখনও পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। ভূমি কর্ষণ কার্যেও বলদই অধিক কার্যকর হয়। সংস্কৃতে ভূমিকেও 'গো' বলা হয় কারণ পৃথিবী যখন অত্যাচারের ভারে পীড়িত হয় তখন সে গোরূপ ধারণ করে শ্রীব্রহ্মার সম্মুখে দুঃখের কথা বলে। এই ভাবে কৃষি ও গোপালনের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ এবং একে অপরের উপর নির্ভরশীল। বৈশ্য ভ্রাতাদের কাছে নিবেদন যে তারা যেন এই দুই ব্যবসাকেও গ্রহণ করে তা সমুন্নত করে।

এক কথায় বর্তমান সময় লোক সেবার জন্য অতিশয় উৎকৃষ্ট। আমাদের ধনী সমাজ এই সুবর্ণময় সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজ সম্পত্তিকে আরও কার্যকর করে তুলুন। ধনের সার্থকতা এতেই যে তা যেন জনতার সেবায় ব্যবহৃত হয়। এই সুযোগ হাতছাড়া হলে পশ্চাত্তাপ হবে। ধনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনেরও কোনো স্থিরতা নেই, আজ আছে আর কাল নেই। আজ যদি আমরা চলে যাই তাহলে সম্পদ আমাদের কোন্ কাজে লাগবে! অতএব জীবিতকালেই অর্থকে সৎকার্যে খরচ করা উচিত। বলা হয়েছে 'বর্তমানেই দান, মহাপুণ্যবান'। এই কথা সকল উত্তম কার্যেও প্রযোজ্য হয়। কোনো ভালো কাজ আগামীকালের জন্য সরিয়ে না রেখে তখনই করে নেওয়া ভালো। তাই কবি বলেছেন—

কাল করৈ সো আজ কর, আজ করৈ সো অব।
পলমেঁ পরলৈ হোয়গী, বহুরি করৈগো কব॥

আমরা এমন কত ধনী ব্যক্তিকে জানি যিনি পরোপকারের জন্য বড় বড় যোজনা করে রেখেছিলেন কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও তা কার্যে পরিণত করতে পারেননি। হঠাৎ তাঁদের মৃত্যুর কবলে পড়তে হয়েছে। মৃত্যুর উপর কারো নিয়ন্ত্রণ নেই, তা প্রতীক্ষাও করে না। তাই যতদিন নিঃশ্বাস আছে, ততদিন আমাদের তা থেকে ভবিষ্যতের পাথেয় তুলে নেওয়া উচিত। মৃত্যুর পর আমরা কিছুই করতে পারব না। বর্তমান জীবনে আমরা যা অর্জন করব তাই পরে কাজে লাগবে। যদি সারাজীবন আমরা পাপ সঞ্চয়ই করে যাই এবং ন্যায়-অন্যায়, ছলচাতুরি, চুরি, অসাধুতা দ্বারা অর্থসংগ্রহ করতে থাকি আর ইচ্ছা মতন ভোগে রত থেকেই আমাদের কর্তব্যের ইতি করি তাহলে আমাদের মানব জীবন শুধু ব্যর্থই হবে না, ভবিষ্যতের জন্যও অতি দুঃখের কারণ হবে।

যে কথা ব্যক্তির জন্য, তা সমষ্টির জন্যও হয়ে থাকে। আজ জগতে চতুর্দিকে হাহাকার হচ্ছে, তার কারণ কী ? পাপই দুঃখের মূল এবং ধর্মই সুখের মূল। আজ আমরা দুঃখের বাহ্য কারণের অনুসন্ধান করে তাকেই দূর করতে সচেষ্ট হই, তাই আমাদের দুঃখ কম না হয়ে বৃদ্ধিই পাচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত রোগের নিদান ঠিকভাবে না হবে, ততক্ষণ হাজার উপচারেও আমরা সাফল্য পাব না। ব্যাধি নাশ করবার জন্য আমাদের মূল দোষকে নাশ করতে হবে। আজ জগৎ যে রোগে আক্রান্ত হয়ে আছে, তার মূল কারণ হল পাপের বৃদ্ধি। যতক্ষণ পর্যন্ত পাপের বৃদ্ধি না থামবে ততক্ষণ আমরা কখনই রোগমুক্ত হতে পারব না। অতএব যদি আমরা নিজেকে ও জগৎকে সুখী দেখতে চাই তাহলে যথাশক্তি আমাদের পাপ থেকে মুক্ত হয়ে ধর্মসঞ্চয়ে রত হতে হবে। তখনই আমরা এবং আমাদের প্রতিবেশীগণ সুখী থাকতে পারবে। ভগবান ব্যাস উচ্চৈঃস্বরে বলেছেন—

উর্ধ্ববাহুর্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিচ্ছৃণোতি মে।
ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেব্যতে॥

(মহা. স্বর্গা. ৫।৬২)

'আমি দুহাত তুলে উচ্চৈঃস্বরে বলি কিন্তু কেউ আমার কথা শোনে না। ভাই সকল ! ধর্ম দ্বারাই সম্পদ ও সুখ লাভ হয়ে থাকে, তাহলে ধর্ম সেবন কেন নয় ?'

কিন্তু আমরা এই ত্রিকালদর্শী মহর্ষিদের হিতকর কথাকে শুনেও শুনি না। আমরা সুখ চাই কিন্তু চলি দুঃখের পথে। চাই দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে কিন্তু দুঃখের হেতু পাপকে আলিঙ্গন করে থাকি। মহর্ষি ব্যাস তাই বলেন—

পুণ্যস্য ফলমিচ্ছন্তি পুণ্যং নেচ্ছন্তি মানবাঃ।
ন পাপফলমিচ্ছন্তি পাপং কুর্বন্তি যত্নতঃ॥

'অর্থাৎ আমরা পুণ্যের ফল সুখ-ভোগের আশা রাখি কিন্তু পুণ্য সঞ্চয় করি না আর পাপের ফল যে দুঃখ তা থেকে দূরে থাকতে চাই কিন্তু যত্নপূর্বক পাপ করা থেকে বিরত হই না।'

এই মানবদেহ আমরা বহু পুণ্যে লাভ করেছি। কেবল তাই নয় ভারতবর্ষসম দেশ, হিন্দুধর্মসম ধর্ম ও কলিযুগসম যুগ আমরা লাভ করেছি। মহাপুরুষগণ কলিযুগকে সকল যুগের সেরা যুগ বলেছেন। অন্য যুগের চেয়ে এতে অতি সহজেই কল্যাণ হয়। গোস্বামী তুলসীদাস বলেন—

কলিজুগ সম জুগ আন নহিঁ, জৌঁ নর কর বিশ্বাস।
গাই রাম গুন গন বিমল, ভব তর বিনহিঁ প্রয়াস॥

এমন অপূর্ব সুযোগ পেয়েও যদি আমরা প্রকৃত সুখ থেকে বঞ্চিত থাকি, বিষয়সুখেই রমণ করি আর পাপ একত্র করতেই নিজ অমূল্য জীবন হারিয়ে ফেলি তাহলে আমাদের থেকে বড় মূর্খ ও কৃতঘ্ন কে হবে ? গোস্বামী তুলসীদাস এমন ব্যক্তিদের আত্মহননকারী বলেছেন।

জো ন তরই ভবসাগর নর সমাজ অস পাই।
সো কৃতনিন্দক মন্দমতি আত্মাহন গতি জাই॥

প্রকৃত সুখ কেবল পরমাত্মাতে আছে। তাই যে প্রকৃত সুখ চায় তার অন্য দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একমাত্র পরমাত্মার শরণাগত হয়ে তাতেই মন নিত্যযুক্ত করে তাঁর ভক্তি ও সেবা করা উচিত। তখন আমাদের সর্বত্রই মঙ্গল হবে। যারা ঈশ্বরবিমুখ হয়ে শুধুমাত্র বিষয়-ভোগেই নিমজ্জিত সেই সকল অজ্ঞানী জীবদের জন্য কী বলা যায় ! তাদের অবস্থা তো সেই অবোধ বিধবা

বালিকাসম—যে পতি বিয়োগের দুঃখই বোঝে না। সে তো পূর্বের মতনই খাওয়া ও ক্রীড়ায় মত্ত। সে জানে না যে তার ভবিষ্যৎ জীবন কীরূপ কষ্টময় হবে, তাকে কত ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে! তার মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন এবং পাড়াপড়শী তার অবস্থায় দুঃখ পায়, ক্রন্দন করে আর তার ভবিষ্যতের কষ্টের কথা স্মরণ করে আক্ষেপ করে। কিন্তু সেই অবোধ বালিকা তাদের কান্নাকাটির কারণ কিছুই বোঝে না। এইভাবেই ভগবৎ বিমুখ জীবদের দেখে সন্ত-মহাত্মাগণ আক্ষেপ করেন, তাদের দশা দেখে দুঃখিত হন আর তাদের ভবিষ্যতের বিপত্তি সম্বন্ধে সতর্ক করেন কিন্তু সেই অজ্ঞানী জীবের চৈতন্য হয় না। তারা নিজ রঙ্গবিলাশে ভুলে থাকে। আমাদের সেই মহাত্মাদের সাবধানবাণীতে মন দিয়ে সজাগ হওয়া উচিত, নাহলে তো আমাদের ঘোর দুর্দশা হবে।

কা বরষা সব কৃষী সুখানেঁ। সময় চুকেঁ পুনি কা পছিতানেঁ।।

———o———

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্॥

গীতা-মহিমা

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা সাক্ষাৎ ভগবানের দিব্য বাণী। অপার, অপরিমিত মহিমাযুক্ত এই দিব্য বাণী ! এঁর মহিমার যথার্থ বর্ণনা কেউ করতে পারে না। শেষ (অনন্ত), মহেশ, গণেশও যখন এর মহিমা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করতে পারেন না, তাহলে মানুষের আর বলার কী আছে ? ইতিহাস পুরাণে স্থানে স্থানে এঁর মহিমা সংকীর্তন করা হয়েছে ; কিন্তু যা বলা হয়েছে তা একত্র করলে বলা যাবে না যে এর মহিমা এতেই সীমিত। প্রকৃত সত্য তো এই যে এর মহিমা সম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করা আদৌ সম্ভব নয়। যে বস্তু বর্ণনা করা যায় তা অপরিমিত কেমন করে হবে ! তা তো পরিমিতই হয়ে যায়।

গীতা এক পরম রহস্যময় গ্রন্থ। এতে সম্পূর্ণ বেদ ও শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করা আছে। এর রচনা এত সহজ সরল যে অল্প অভ্যাসেই মানুষ একে বুঝতে সক্ষম হয়, কিন্তু এর দর্শন (তাৎপর্য) এত গূঢ় ও গম্ভীর যে আজীবন নিরন্তর অভ্যাস করতে থাকলেও এর শেষ খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রত্যহ নিত্যনতুন ভাব উৎপন্ন হয় যাতে এই গ্রন্থ সতত নবীন বলে মনে হয় এবং একাগ্রচিত্তে শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে ভেবে দেখলে এর পদে পদে গভীর রহস্য প্রতিভাত হতে থাকে। ভগবানের গুণ, প্রভাব, স্বরূপ, মর্ম ও উপাসনা এবং কর্ম ও জ্ঞানের বর্ণনা যেমনভাবে গীতাশাস্ত্রে করা হয়েছে তেমন অন্য গ্রন্থে একসঙ্গে লাভ করা কঠিন ; শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা এমন এক অনুপম শাস্ত্র যার একটা শব্দও সদুপদেশ বিহীন নয়। গীতায় এমন একটি কথাও নেই যাকে অতিরঞ্জিত বলা যায়। এঁর প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে যথার্থ ; সত্যস্বরূপ ভগবানের বাণীকে অলীক কল্পনা করলে বস্তুত তাঁর অনাদর করা হয়।

গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী। এঁতে সর্বশাস্ত্রের সার সংগৃহীত হয়েছে। তাকে যদি সর্বশাস্ত্রের সম্পদসার বলা হয় তাহলেও অত্যুক্তি হবে না। উত্তমরূপে গীতা অধিগত হলে সর্বশাস্ত্রের তাত্ত্বিক জ্ঞান আপনাআপনি হতে পারে, তার জন্য পৃথকভাবে পরিশ্রম করার প্রয়োজন হয় না।

গীতা গঙ্গার থেকেও শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রে গঙ্গাস্নানের ফলরূপে মুক্তিলাভের কথা বলা আছে। কিন্তু গঙ্গায় যে অবগাহন করে সে নিজে মুক্ত হতে পারে, তার অন্যকে উদ্ধার করবার সামর্থ্য থাকে না। কিন্তু গীতারূপ গঙ্গায় যে ডুব দেয় সে স্বয়ং তো মুক্ত হয়ই উপরন্তু সে অন্যকেও তারণ করবার সামর্থ্যও অর্জন করে। গঙ্গা তো ভগবানের চরণ নিঃসৃত কিন্তু গীতা সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণের শ্রীমুখ নিঃসৃত। আর গঙ্গা তো শুধুমাত্র অবগাহন-কারীকেই মুক্ত করে কিন্তু গীতা তো ঘরে ঘরে পৌঁছে মুক্তির দ্বার উন্মোচন করে। এই সব কারণে গঙ্গা থেকেও গীতার মহিমা বেশি।

আগেই বলা হয়েছে যে গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী। মহাভারতেও বলা আছে—**সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা** (ভীষ্মপর্ব ৪৪।৪)। কিন্তু শুধু এটুকু বলাই পর্যাপ্ত নয়, কারণ সর্বশাস্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে বেদ থেকে, বেদের উৎপত্তি ভগবান শ্রীব্রহ্মার মুখ থেকে এবং শ্রীব্রহ্মা ভগবানের নাভিকমল থেকে উৎপন্ন হয়েছেন। এইভাবে শাস্ত্র এবং ভগবানের মধ্যে বেশ ব্যবধান উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু গীতা তো স্বয়ং ভগাবনের শ্রীমুখ নিঃসৃত তাই তাকে যদি সর্ব শাস্ত্রের চেয়েও অধিক বলা হয় তাহলে তাতেও কোনো অত্যুক্তি হবে না। স্বয়ং ভগবান বেদব্যাস বলেছেন—

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা।।

(মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ৪৪।১)

'গীতার উত্তমরূপে সংকীর্তন করা উচিত, অন্য শাস্ত্রের বিস্তারের দরকার কী ? কারণ গীতা স্বয়ং পদ্মনাভ ভগবানের সাক্ষাৎ মুখকমল থেকে নিঃসৃত হয়েছে।'

এই শ্লোকে 'পদ্মনাভ' শব্দ ব্যবহার করে মহাভারতকার এই কথাই বলতে চেয়েছেন। তাৎপর্য এই যে এই গীতা সেই ভগবানের মুখকমল থেকে

নিঃসৃত হয়েছে, যাঁর নাভিকমল থেকে শ্রীব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েছেন এবং শ্রীব্রহ্মার মুখ থেকে বেদ নিঃসৃত হয়েছে—যা সম্পূর্ণ শাস্ত্রের মূল।

গীতা গায়ত্রী থেকে উত্তম। এই কথা সত্য যে গায়ত্রী জপ করলে মানুষ মুক্তি লাভ করে ; কিন্তু গায়ত্রী জপকারী তো কেবল স্বয়ংই মুক্ত হয় আর গীতা অভ্যাসকারী তো অপরেরও পরিত্রাতা হতে পারে। মুক্তিপ্রদাতা স্বয়ং ভগবানই যখন তার বশীভূত হন তাহলে মুক্তির আর কী কথা ! মুক্তি তো তাঁর চরণধূলিতে বাস করে। তাই তো সে মুক্তির ভাণ্ডার খুলে দেয়।

যদি গীতাকে আমরা স্বয়ং ভগবানের থেকেও বড় বলি তাহলেও অত্যুক্তি হবে না। ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে চোত্তমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানমুপাশ্রিত্য ত্রীঁল্লোকান্ পালয়াম্যহম্।। (বরাহপুরাণ)

'আমি গীতার আশ্রয়ে থাকি, গীতা আমার শ্রেষ্ঠ গৃহ। গীতা-জ্ঞানের সাহায্য নিয়ে আমি ত্রিলোক পালন করি।'

তাছাড়া গীতাতে ভগবান মুক্তকণ্ঠে এই ঘোষণা করেছেন, যে কেউ আমার এই গীতারূপ আদেশ পালন করবে সে নিঃসন্দেহে মুক্ত হয়ে যাবে ; কেবল তাই নয় ভগবান আরও বলছেন, যে কেউ গীতা অধ্যয়ন করবে তার দ্বারা আমি জ্ঞানযজ্ঞ (দ্বারা) পূজিত হব। গীতার শুধুমাত্র অধ্যয়ন মাত্রের যখন এতই মাহাত্ম্য তাহলে যে ব্যক্তি এর উপদেশ অনুসারে নিজের জীবন তৈরি করে ও এর রহস্য ভক্তদের ধারণ করায় এবং তাদের মধ্যে এর বিস্তার ও প্রচার করে তাঁর সম্বন্ধে বলার কী থাকতে পারে ! তার জন্য ভগবান জানিয়েছেন যে, সে আমার অতিশয় প্রিয়। তাঁকে ভগবানের প্রাণাধিক প্রিয় বলা হলেও কিছু ভুল বলা হবে না। ভগবান এমন ভক্তদের অধীন হয়ে যান। শ্রেষ্ঠ পুরুষদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, তাঁর সিদ্ধান্ত যে পালন করে সে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় হয়ে থাকে। গীতাগ্রন্থ হল ভগবানের এক অতিশয় প্রধান রহস্যময় আদেশ। এমন অবস্থায় গীতা-উপদেশ পালনকারী তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় হবে—এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে ?

গীতা ভগবানের শ্বাসপ্রশ্বাস, হৃদয়, ভগবানের বাঙ্ময় মূর্তি। যার অন্তর, বাণী, অঙ্গ ও সকল ইন্দ্রিয় আর সকল ক্রিয়া গীতাময় হয়েছে সেই ব্যক্তি তো

সাক্ষাৎ গীতার প্রতিমূর্তি। তার দর্শন, স্পর্শ, ভাষণ এবং চিন্তায় অন্য ব্যক্তিও পরম পবিত্র হয়ে যায়। তাহলে তার আদেশপালন ও অনুকরণকারী ব্যক্তির কথাই আলাদা ! বস্তুত জগতে গীতার সমকক্ষ যজ্ঞ, দান, তপস্যা, তীর্থ, ব্রত, সংযম ও উপবাস আদি কিছুই নেই।

গীতা সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী। তার সংকলনকর্তা হলেন ব্যাসদেব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত উপদেশ বহু স্থানে শ্লোকরূপে কথিত হয়েছিল যা ব্যাসদেব অবিকৃতভাবে রেখে দিয়েছেন। কিছু অংশ, যা গদ্য আকারে বলা হয়েছিল তাকে ব্যাসদেব স্বয়ং শ্লোকবদ্ধ করেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে অর্জুন, সঞ্জয় এবং ধৃতরাষ্ট্রের কথাগুলিকে নিজ ভাষায় গ্রথিত করেছেন আর এই গ্রন্থকে অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত করে মহাভারতের মধ্যে যুক্ত করেছেন যাকে আজ আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলি।

গীতার তাৎপর্য

গীতা জ্ঞানের অসীম, অগাধ সাগর ; জ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ। গীতার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে বড় বড় দিগ্গজ বিদ্বান ও তত্ত্ব আলোচনাকারী মহাত্মাদের বাণীও কুণ্ঠিত হয়ে যায়, কারণ এর পূর্ণ রহস্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণই জানেন। তারপর এর সংকলক ব্যাসদেব ও অর্জুনের কথা বলা যেতে পারে। আমার মতন ব্যক্তির পক্ষে এমন অগাধ রহস্যময় গীতার বক্তব্য ও মহত্ত্ব জানা ঠিক তেমনই, যেমন এক সাধারণ পক্ষীর অনন্ত আকাশের খোঁজ করবার চেষ্টা করা। গীতা অনন্ত ভাবের অসীম সাগর। রত্নাকরে (সমুদ্রে) গভীর ডুব দিলে যেমন রত্নলাভ হয় তেমনই গীতাসাগরের গভীরে ডুব দিলে জিজ্ঞাসুগণ নিত্যনতুন বিলক্ষণ ভাব-রত্নরাজির উপলব্ধি লাভ করে থাকেন। কিন্তু আকাশে গরুড়ও ওড়ে, মশকও ওড়ে। এইভাবে যে যার ভাব অনুসারে কিছু অনুভব করে। অতএব বিচার করলে মনে হয় যে গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য হল অনাদিকাল থেকে অজ্ঞানের বশীভূত হয়ে সংসার-সাগর চক্রে পতিত মানবকুলকে ঈশ্বর-লাভের উপযুক্ত করে তোলা এবং এর জন্য গীতায় এমন বহু উপায় জানানো হয়েছে যা পালন করলে মানুষ নিজ-নিজ সাংসারিক কাজকর্ম যথার্থ রূপে পালন করে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে।

ব্যবহারে পরমার্থ প্রয়োগের এই অদ্ভুত কলা (যুক্তি) গীতায় বলা হয়েছে এবং অধিকারী ভেদে পরমাত্মা লাভের জন্য দু-প্রকারের নিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। সেই দুটি নিষ্ঠা হল—জ্ঞাননিষ্ঠা এবং যোগনিষ্ঠা (৩।৩)। এইখানে প্রশ্ন ওঠে যে প্রায় সকল শাস্ত্রেই ঈশ্বর লাভের জন্য তিনটি প্রধান পথের কথা বলা হয়েছে—কর্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান। তাহলে গীতায় কেবলমাত্র দুইটি নিষ্ঠার কথা কেন মানা হল ? তাহলে কী গীতায় ভক্তি সিদ্ধান্তকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি ? অনেকে তো গীতার উপদেশ ভক্তিপ্রধানই বলে থাকেন এবং যত্রতত্র ভগবান ভক্তির বিশেষ মহত্ত্ব স্পষ্ট কথায় বলেছেন (৬।৪৭) এবং ভক্তির দ্বারা তাঁর প্রাপ্তি সুলভ বলে জানিয়েছেন (৮।১৪ ; ১১।৫৪)। এর উত্তর হচ্ছে যে গীতায় ভক্তিকে ঈশ্বরলাভের প্রধান সাধন বলা হয়েছে এবং তাঁদের এই ধারণা যথার্থ। গীতায় ভক্তির স্থান অনেক উঁচুতে এবং বহু স্থানে অর্জুনকে ভক্ত হতে আদেশ দেওয়া হয়েছে (৯।৩৪ ; ১২।৮ ; ১৮।৫৭, ৬৫, ৬৬)। কিন্তু গীতায় দুটি নিষ্ঠা মানা হয়েছে। এতে ভক্তি যোগনিষ্ঠার অন্তর্গত রয়েছে। ভক্তি ক্রিয়াত্মক হওয়ায় গীতার এই সিদ্ধান্তকে যুক্তিবিরুদ্ধও বলা যায় না। ভক্তি কীভাবে যোগনিষ্ঠার অন্তর্গত—এটি সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে।

এছাড়া জ্ঞান ও কর্ম শব্দ যে-সকল অর্থে গীতায় ব্যবহৃত হয়েছে তাও বিশেষ রহস্যময়। গীতা অনুসারে কর্ম এবং কর্মযোগ আর জ্ঞান এবং জ্ঞানযোগ একই অর্থবহ নয়। গীতা অনুসারে শাস্ত্রবিহিত কর্ম জ্ঞাননিষ্ঠা এবং যোগনিষ্ঠা—উভয় সাধনপথেই হতে পারে। জ্ঞাননিষ্ঠায় কর্ম সম্পাদনে বিরোধ নেই এবং যোগনিষ্ঠায় তো কর্ম সম্পাদনই পথ মানা হয়েছে (৬।৩) এবং বাহ্যত কর্ম ত্যাগকে বাধাসৃষ্টিকারী বলা হয়েছে (৩।৪)। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৪৭ থেকে ৫১ শ্লোক পর্যন্ত ও তৃতীয় অধ্যায়ে ১৯ এবং চতুর্থ অধ্যায়ে ৪২ শ্লোকে অর্জুনকে যোগনিষ্ঠার দৃষ্টিতে কর্ম সম্পাদন করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং অধ্যায় ৩।২৮ ও ৫।৮, ৯, ১৩ শ্লোকে সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠার দৃষ্টিতে কর্ম সম্পাদন করবার কথা বলা হয়েছে। সকাম কর্মের জ্ঞাননিষ্ঠা বা কর্মনিষ্ঠা—কোনো নিষ্ঠায় স্থান নেই, সকাম কর্মীদের তো ভগবান তুচ্ছ বলেছেন (২।৪২-৪৪ ; ৭।২০-২৩ ; ৯।২০, ২১)।

জ্ঞান শব্দের অর্থ গীতাতে কেবল জ্ঞানযোগই নয়। ফলরূপ জ্ঞান—যা সর্বপ্রকারের সাধনার ফল এবং যা জ্ঞাননিষ্ঠা এবং যোগনিষ্ঠা দুইয়েরই ফল আর যাকে যথার্থ জ্ঞান অথবা তত্ত্বজ্ঞানও বলে, সেটিও 'জ্ঞান' শব্দ দ্বারা উল্লিখিত হয়েছে। অধ্যায় ৪।২৪ এবং ২৫ শ্লোকের উত্তরার্ধে জ্ঞানযোগের বর্ণনা করা আছে এবং অধ্যায় ৪।৩৬-৩৯এ ফলরূপ জ্ঞানের বর্ণনা আছে। এইভাবে অন্যত্রও প্রসঙ্গানুসার ধরে নেওয়া উচিত।

শাস্ত্রে কর্ম ও জ্ঞান ছাড়া যে উপাসনার প্রকরণ উদ্ধৃত হয়েছে সেটি এই দুই নিষ্ঠার অন্তর্গত রয়েছে। যখন নিজেকে পরমাত্মা থেকে অভিন্ন মেনে উপাসনা করা হয় তখন তা সাংখ্যনিষ্ঠার অন্তর্গত হয় আর যখন ভেদদৃষ্টিতে উপাসনা করা হয় তখন সেটিকে যোগনিষ্ঠার অন্তর্গত ধরা হয়। সাংখ্যনিষ্ঠা ও যোগনিষ্ঠায় এই হল বিশেষ প্রভেদ। এইভাবে অধ্যায় ১৩।২৪-এ কেবল ধ্যান দ্বারা পরমাত্মা লাভের কথা বলা হয়েছে কিন্তু এক্ষেত্রেও ধরে নিতে হবে যে, যে ধ্যান অভেদদৃষ্টিতে করা হয় তা সাংখ্যদর্শনের অন্তর্গত আর যা ভেদ দৃষ্টিতে করা হয় তা যোগনিষ্ঠার অন্তর্গত।

গীতাতে কেবল ভজন-পূজা অথবা কেবল ধ্যানের দ্বারা তাঁকে লাভ করার কথা জানিয়ে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, যোগনিষ্ঠায় সকল অঙ্গের সাধনার দ্বারা তাঁর প্রাপ্তি সম্বন্ধে বলার কী থাকতে পারে, সাধনায় এক-একটি অঙ্গের দ্বারাও তাঁর প্রাপ্তি হতে পারে। এটি হল তাঁর কৃপা যে তিনি নিজেকে জীবের জন্য এত সুলভ করে দিয়েছেন। এবারে সাংখ্যনিষ্ঠা ও যোগনিষ্ঠার স্বরূপ কী ? তাদের মধ্যে প্রভেদ কোথায় ? তাদের মধ্যে কত ও কী প্রকারের অবান্তর ভেদ আছে ? অথবা দুই নিষ্ঠা কি স্বতন্ত্র অথবা পরস্পর সাপেক্ষ ? আর এই সকল নিষ্ঠার প্রকৃত অধিকারী কে ? ইত্যাদি প্রসঙ্গে এখন আলোচনা করা হচ্ছে।

সাংখ্যনিষ্ঠা ও যোগনিষ্ঠার স্বরূপ

১) সম্পূর্ণ পদার্থ মৃগতৃষ্ণার জলের ন্যায় অথবা স্বপ্নসদৃশ মায়াময় হওয়ায় মায়ার কার্যরূপ সম্পূর্ণ গুণই গুণে প্রবৃত্ত হচ্ছে—এইভাবে মনে করে মন-ইন্দ্রিয় ও শরীর দ্বারা কৃত সমস্ত কর্মে অভিমান থেকে রহিত হওয়া

(গীতা ৫।৮-৯) এবং সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার স্বরূপে সমভাবে নিত্য স্থিত থেকে এক সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেব ছাড়া অন্য কারো অস্তিত্বের ভাবনা না রাখা (গীতা ১৩।৩০)—এই হল সাংখ্যনিষ্ঠা। এটিকে জ্ঞানযোগ অথবা কর্মসন্ন্যাসও বলা হয়। আর—

২) সব কিছু ভগবানের ভেবে, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমভাব রেখে আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে ভগবৎ-আদেশানুসারে সকল কর্মের আচরণ করা (২।৪৭-৫১) অথবা শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্বক মন, বাণী ও শরীর দ্বারা সর্বপ্রকারে ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁর নাম, গুণ এবং প্রভাবসহ তার স্বরূপের সতত অনুধ্যান করা (৬।৪৭)—এই হল যোগনিষ্ঠা। একেই ভগবান সমত্বযোগ, বুদ্ধিযোগ, তদর্থকর্ম, মদর্থকর্ম, সাত্ত্বিক ত্যাগ প্রভৃতি নামে উল্লেখ করেছেন।

যোগনিষ্ঠায় সাধারণভাবে অথবা প্রধানভাবে ভক্তি সঙ্গে থাকে। গীতোক্ত যোগনিষ্ঠা ভক্তিশূন্য নয়। যেখানে ভক্তি অথবা ভগবানের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা নেই (২।৪৭-৫১) সেইখানেও ভগবানের আদেশের পালন রয়েছে আর তার ফলও ঈশ্বরলাভ—এই দৃষ্টিতে এক্ষেত্রেও ভক্তির সম্বন্ধ রয়েছে।

জ্ঞাননিষ্ঠা সাধনার জন্য ভগবান অনেক যুক্তির নির্দেশ করেছেন, সেই সকলের ফল হল একমাত্র সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাকে লাভ করা। জ্ঞান-যোগের বহু অবান্তর ভেদ থাকলেও তাকে মুখ্য চারভাগে বিভক্ত করা যায়—

১) যা কিছু আছে তা সবই ব্রহ্ম।

২) যা কিছু দৃশ্য তা মায়াময় ; বস্তুত এক সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নেই।

৩) যা কিছু প্রতীত হয় তা সবই আমার স্বরূপ—আমিই।

৪) যা কিছু প্রতীত হয় তা মায়াময়, অনিত্য, বাস্তবে নেই ; কেবল এক চৈতন্যময় আত্মা আমিই আছি।

এর প্রথম দুই পথ 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের 'তৎ' পদের দৃষ্টিতে কথিত আর শেষ দুই পথ 'ত্বম্' পদের দৃষ্টিতে বলা হয়েছে। এর বিশ্লেষণ এইভাবে করা যায়—

১) এই বিশ্বচরাচরে যা কিছু প্রতীত হয় সবই ব্রহ্ম ; এক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা ছাড়া আর কোনো বস্তুই নেই। যা কিছু কর্ম করি সেই কর্ম, সেই কর্মের সাধন এবং উপকরণ ও কর্তা নিজেও সব কিছুই ব্রহ্ম (৪।২৪)। যেমন ভাবে সমুদ্রে ভেসে থাকা বরফের চাঁই-এর বাইরে, ভিতরে সর্বত্র জল বর্তমান আর সেই বরফশিলা নিজেও জল—সেইভাবে সমগ্র বিশ্বচরাচর সৃষ্টির বাইরে-ভিতরে একমাত্র পরমাত্মাই পরিপূর্ণ আর সর্বভূতের রূপেও তিনিই (১৩।১৫)।

২) যা কিছু দৃশ্যবস্তু তা মায়াময়, ক্ষণিক ও বিনাশশীল ভেবে—তাকে সত্তাশূন্য মনে করে একমাত্র সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাই আছেন আর কিছুই নেই—এই মনে করে মন-বুদ্ধিকে ব্রহ্মে তদ্রূপ করে দেওয়া এবং পরমাত্মার সঙ্গে নিজেকে একীভূত করে অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা তাঁতে একাকার হয়ে যাওয়া (৪।২৫-এর উত্তরার্ধ ; ৫।১৭)।

৩) এই বিশ্বচরাচর ব্রহ্ম এবং সেই ব্রহ্ম আমি ; তাই সকলই আমার স্বরূপ—এইরূপে সম্পূর্ণ বিশ্বচরাচরের প্রাণীদের নিজ আত্মাই ভাবা অর্থাৎ সর্বভূতে নিজ আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা আর আত্মার অন্তর্গত সর্বভূতকে দেখা (৬।২৯)।

এই প্রকারের সাধনকারীর দৃষ্টিতে এক ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছুই থাকে না, তখন সে সেই বিজ্ঞানানন্দঘন স্বরূপেই আনন্দ অনুভব করে (১৮।৫৪)।

৪) এই মায়াময় ত্রিগুণের কার্যরূপ যা কিছু দৃশ্যবর্গ আছে তাকে আর তার দ্বারা কৃত সকল কর্মকে নিজের থেকে পৃথক, বিনাশশীল এবং অনিত্য ভাবা এবং এই সকলের অতিশয় অভাব করে কেবল ভাবরূপ আত্মার অনুভব করা (১৩।৩৪)।

এইরূপ স্থিতি লাভ করবার জন্য ভগবান গীতায় বিভিন্ন স্থান বহু যুক্তি দ্বারা সাধককে এই কথায় বোঝাতে চেয়েছেন যে আত্মা, দ্রষ্টা, সাক্ষী, চেতন ও নিত্য আর এই দেহাদি জড়-বস্তু—যা কিছু প্রতীত হয়—অনিত্য হওয়ায় অসৎ ; কেবল আত্মাই সৎ। এই কথার সমর্থনে ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১১ থেকে ৩০ শ্লোক পর্যন্ত নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, নিরাকার, নির্বিকার, অক্রিয়, গুণাতীত আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। অভেদরূপে সাধনাকারী

ব্যক্তি আত্মার এরূপ স্বরূপ জেনে সাধনা করলে সাক্ষাৎকার লাভ করে। যা কিছু চেষ্টা হচ্ছে গুণেরই গুণে হচ্ছে, আত্মার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই (৫।৮,৯ ; ১৪।১৯)—আত্মা কিছু করে না, করায়ও না—এই বুঝে সতত নিজের মধ্যেই অতিশয় আনন্দ অনুভূতি লাভ করে থাকে (৫।১৩)।

উপরোক্ত জ্ঞানযোগের চারটি সাধনের মধ্যে প্রথম দুই সাধন হল ব্রহ্মের উপাসনার সঙ্গে যুক্ত আর শেষ দুই অহংগ্রহ—এই উপাসনার সঙ্গে যুক্ত।

এইখানে প্রশ্ন ওঠে যে উক্ত চারটি সাধনা ব্যুত্থান অবস্থায় করা সম্ভব অথবা ধ্যানাবস্থায় কিংবা দুই অবস্থাতেই করা যায়। এর উত্তর এই যে প্রথম সাধনার প্রথম অংশ অধ্যায় ৪।২৪ অনুসারে করতে হবে এবং চতুর্থ সাধনার শেষাংশে যে প্রক্রিয়া পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টম ও নবম শ্লোক অনুসারে বলা আছে—এই দুটি কেবলমাত্র ব্যবহার কালে করা সম্ভব এবং দ্বিতীয় সাধন কেবল ধ্যানকালেই করা যেতে পারে। অবশিষ্ট সকল সাধনা দুই অবস্থাতেই করা যায়।

এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারে—প্রথম সাধনা **'বাসুদেবঃ সর্বমিতি'** যা কিছু দৃশ্য সব বাসুদেবেরই স্বরূপ (৭।১৯) এবং **'সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ'** —যে ব্যক্তি একীভাবে স্থিত হয়ে সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেবকেই ভজন করে (৬।৩১)—এই দুটি পথের উল্লেখ এখানে কেন করা হয়নি। এর উত্তর এই যে এই দুই শ্লোক ভক্তি প্রসঙ্গের এবং দুইটিতেই যিনি ঈশ্বর লাভ করেছেন তাঁর বর্ণনা করা হয়েছে ; তাই এই প্রসঙ্গে তাঁর উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু যদি কেউ একে জ্ঞানপ্রসঙ্গের অন্তর্গত মনে করে সেই অনুসারে সাধনা করতে চায়, তাহলে করতে পারে ; এতে কোনো আপত্তি নেই।

যেভাবে উপরে সাংখ্যনিষ্ঠার চার ভাগ করা হয়েছে সেইভাবে যোগনিষ্ঠারও তিন ভাগ করা হতে পারে—

১) কেবলমাত্র কর্মযোগ

২) ভক্তিমিশ্রিত কর্মযোগ

৩) ভক্তিপ্রধান কর্মযোগ

১) কেবলমাত্র কর্মযোগের উপদেশকালে ভগবান কোথাও কোথাও

শুধুমাত্র ফল ত্যাগের কথা জানিয়েছেন (৫।১২ ; ৬।১ ; ১২।১১ ; ১৮।১১), কোথাও কেবল আসক্তি ত্যাগের কথা বলেছেন (৩।১৯ ; ৬।৪) আর কোথাও ফল ও আসক্তি দুইই ত্যাগের কথা বলেছেন (২।৪৭, ৪৮ ; ১৮।৬, ৯)। যেখানে কেবল ফলত্যাগের কথা বলা হয়েছে সেইখানে আসক্তি ত্যাগকেও ধরে নেওয়া উচিত এবং যেখানে কেবল আসক্তি ত্যাগের কথা বলা হয়েছে সেখানে ফলত্যাগের কথাও মেনে নিতে হবে। ফল ও আসক্তি—দুই ত্যাগ হলে তখনই কর্মযোগের সাধনা সম্পূর্ণ হয়।

২) ভক্তিমিশ্রিত কর্মযোগ— এতে সম্পূর্ণ জগত পরমেশ্বরে পরিব্যাপ্ত মনে করে নিজ নিজ কর্মোচিত কর্মের দ্বারা ভগবানের পূজা করবার কথা বলা হয়েছে (১৮।৪৬) ; তাই একে ভক্তিমিশ্রিত কর্মযোগ বলা যেতে পারে।

৩) ভক্তিপ্রধান কর্মযোগ—এটিকে দুভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।

(ক) ভগবদ্ অর্পণ কর্ম, (খ) ভগবদর্থ কর্ম।

ভগবদর্পণ কর্মও দুই ভাবে করা হয়। পূর্ণ ভগবদর্পণ তখনই হয় যখন সমস্ত কর্মে মমতা, আসক্তি ও ফলেচ্ছা ত্যাগ করে এবং এই সব কিছুই ভগবানের ; আমিও ভগবানের, ভগবান আমাকে দিয়ে বাজিকরের পুতুলের ন্যায় সকল কার্য করিয়ে নিচ্ছেন—এইরূপ মনে করে ভগবানের আদেশ অনুসার ভগবানের প্রসন্নতার জন্য সকল শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা (৩।৩০ ; ১২।৬ ; ১৮।৫৭, ৬৬)।

এ ছাড়া পূর্বে কোনো ভিন্ন উদ্দেশ্যে কর্ম আরম্ভ করে পরে তা ভগবানকে অর্পণ করে দেওয়া, কর্ম করাকালীন মাঝখানে সেটিকে ভগবানে অর্পণ করে দেওয়া, কর্ম সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে ভগবানে অর্পণ করা অথবা কর্মের ফলমাত্র ভগবানকে অর্পণ করে দেওয়া —এ সবই ভগবদর্পণের প্রকার-ভেদ, যদিও তা ভগদর্পণের প্রারম্ভিক সিঁড়ি। এমন করতে করতেই উপরোক্ত সমর্পণের পূর্ণতা লাভ হয়।

'ভগবদর্থ' কর্মও দুই প্রকারের হয়ে থাকে—

(১) ভগবানের বিগ্রহ আদির অর্চনা ও ভজন-ধ্যান আদি উপাসনারূপ কর্ম যা ভগবানের নিমিত্ত করা হয় এবং (২) বাহ্যিকভাবেও যা ভগবৎ সম্বন্ধযুক্ত তাকেও 'ভগবদর্থ' বলা যেতে পারে।

এছাড়া যে সকল শাস্ত্রবিহিত কর্ম ভগবৎপ্রাপ্তি, ভগবৎপ্রেম অথবা ভগবানের প্রসন্নতার জন্য ভগবানের আদেশ অনুসারে করা হয় তাও 'ভগবদর্থ' কর্মের অন্তর্গত হয়। এই দুই প্রকারের কর্ম 'মৎকর্ম' ও 'মদর্থ কর্ম' নামেও গীতায় উল্লিখিত হয়েছে (১১।৫৫ ; ১২।১০)।

যাকে অনন্যভক্তি অথবা ভক্তিযোগ বলা হয়েছে (৮।১৪, ২২ ; ৯।১৩, ১৪, ২২, ৩০, ৩৪ ; ১০।৯ ; ১৩।১০ ; ১৪।২৬) তাও 'ভগদর্পণ' এবং 'ভগবদর্থ'—এই দুই কর্মেরই অন্তর্গত। এই সবেরও ফল হল ভগবৎপ্রাপ্তি।

এখন প্রশ্ন ওঠে যে, যোগনিষ্ঠা কি স্বতন্ত্ররূপে ভগবৎপ্রাপ্তি করায় অথবা জ্ঞাননিষ্ঠার অঙ্গ হয়ে ভগবৎপ্রাপ্তি করায়। এর উত্তরে বলা যায় যে গীতায় দুটি সিদ্ধান্তকেই মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ভগবদ্গীতা যোগনিষ্ঠাকে ভগবৎপ্রাপ্তির বা মোক্ষের স্বতন্ত্র পথও মানে এবং জ্ঞাননিষ্ঠার সহায়ক রূপেও মান্য করে। সাধক চাইলে জ্ঞাননিষ্ঠার সাহায্য ব্যতিরেকে সোজা কর্মযোগের দ্বারা পরমসিদ্ধি লাভ করতে পারে অথবা কর্মযোগের দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ করে তারপর জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা ঈশ্বরলাভ করতে পারে। এই দুইয়ের মধ্যে সাধক কোন্ পথটি গ্রহণ করবে তা তার উপর নির্ভর করে। যোগনিষ্ঠা স্বতন্ত্র সাধন—ভগবান সুস্পষ্ট কথায় এটি অধ্যায় (৫।৪, ৫ ও ১৩।২৪)-এ জানিয়েছেন। ভগবানে চিত্ত অর্পণ করে ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম পালন করলে ভগবানের কৃপায় সাধক শীঘ্রই তাঁকে পেতে পারে ; বহু স্থানে ভগবান এই কথার উল্লেখ করেছেন—(৮।৭ ; ১১।৫৫ ; ১২।৬-৮ ; ১৮।৫৬-৫৮,৬২)। তদনুরূপভাবে নিষ্কাম কর্ম ও উপাসনা দুইই জ্ঞাননিষ্ঠার অঙ্গও হতে পারে। কিন্তু অভেদ উপাসনা হলে জ্ঞাননিষ্ঠা ভেদ উপাসনারূপ ভক্তিযোগ অর্থাৎ যোগনিষ্ঠার অঙ্গ হতে পারে না। তবে জ্ঞাননিষ্ঠার সাধক পরবর্তীকালে যদি নিজের মত বদল করে অথবা তার রুচির পরিবর্তন হয় এবং সে জ্ঞাননিষ্ঠাকে ছেড়ে যোগনিষ্ঠাকে আশ্রয় করে, তবে যোগনিষ্ঠার দ্বারাও তাঁর ভগবৎপ্রাপ্তি হয়।

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে কর্মযোগের সাধনা করে পরবর্তীকালে যে সাংখ্যযোগের মাধ্যমে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাকে লাভ করে, তার সাধন-

প্রণালী কেমন হয় ? এটি বুঝবার জন্য 'ত্যাগ'কে নিম্নোক্ত সাতটি ভাগে ভাগ করে বিস্তারিত ভাবে বলা হচ্ছে।

(১) নিষিদ্ধ কর্মের সর্বতোভাবে ত্যাগ

চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা, কপট, ছল, বলপ্রয়োগ, হিংসা, অভক্ষ ভোজন এবং প্রমাদ আদি শাস্ত্র-বিরুদ্ধ অধর্ম কর্ম কায়মনোবাক্যে না করা। এটি হল প্রথম পর্যায়ের ত্যাগ।

(২) কাম্য-কর্মের ত্যাগ

স্ত্রী, পুত্র ও সম্পদ আদি প্রিয় বস্তু প্রাপ্তির জন্য এবং রোগ সংকটাদির নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে কৃত কর্ম—যজ, দান, তপস্যা ও উপাসনা আদি সকাম কর্মকে নিজ স্বার্থের জন্য না করা। এটা দ্বিতীয় পর্যায়ের ত্যাগ।

যদি কোনো লৌকিক অথবা শাস্ত্রীয় এমন কর্ম সংযোগবশত এসে উপস্থিত হয় যা বাহ্যিকভাবে সকাম হলেও তা না করলে কোনো ব্যক্তির কষ্ট হয় অথবা কর্ম উপাসনা পদ্ধতিতে কোনোরকম বাধা আসে, তাহলে স্বার্থ ত্যাগ করে কেবল লোকসংগ্রহ হেতু তা করা সকাম কর্ম নয়।

(৩) তৃষ্ণার সর্বতোভাবে ত্যাগ

মান, প্রশংসা, প্রতিষ্ঠা এবং স্ত্রী, পুত্র ও সম্পদ যা কিছু অনিত্য বস্তু প্রারব্ধ অনুসারে লাভ হয়েছে সেগুলিকে বৃদ্ধি করবার ইচ্ছাকে ভগবৎ প্রাপ্তিতে অন্তরায় মনে করে তা ত্যাগ করা। এটা তৃতীয় পর্যায়ের ত্যাগ।

(৪) স্বার্থের জন্য অপরের দ্বারা সেবা গ্রহণ ত্যাগ করা

নিজ সুখের জন কারো সম্পদাদি বস্তু অথবা সেবার জন্য যাচনা করা এবং যাচনা ছাড়াই পাওয়া বস্তু অথবা সেবা স্বীকার করা অথবা কোনো ভাবেই নিজ স্বার্থ সিদ্ধির ইচ্ছা মনে পোষণ করা—ইত্যাদি স্বার্থের দৃষ্টিতে অন্যকে দিয়ে সেবা করাবার যে চিন্তা—সেই সকল ত্যাগ করা। এটি চতুর্থ পর্যায়ের ত্যাগ।

যদি আপনার পদ-মর্যাদা অনুসারে এমন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যেখানে শরীর সম্বন্ধিত সেবা অথবা খাদ্যাদি পদার্থ স্বীকার না করলে কারো কষ্ট হয় অথবা লোকশিক্ষায় কোনো ভাবে বাধা আসে তাহলে স্বার্থ ত্যাগ করে অপরের প্রীতির জন্য সেবাদি স্বীকার করে নেওয়া দোষের হয় না ;

কারণ স্ত্রী, পুত্র ও সেবক আদি দ্বারা কৃত সেবা এবং বন্ধুবান্ধব ও মিত্র দ্বারা দেওয়া ভোজনসামগ্রী স্বীকার না করলে তাদের কষ্ট হওয়া ও লোকমর্যাদায় বাধার সৃষ্টি হতে পারে।

(৫) সকল কর্তব্যকর্মে আলস্য ও ফলেচ্ছার সর্বতোভাবে ত্যাগ

ঈশ্বরের ভক্তি, দেবতার পূজা, মাতা-পিতাদি গুরুজনদের সেবা, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও বর্ণাশ্রম অনুসারে জীবিকা দ্বারা গার্হস্থ্য নির্বাহ এবং শারীরিক খাওয়া-দাওয়া আদি যত কর্তব্যকর্ম আছে সেই সবেতে আলস্য ও সর্বপ্রকারের কামনা ত্যাগ করা। এই হল পঞ্চম পর্যায়ের ত্যাগ।

(৬) জগতের সকল বস্তু ও কর্মে মমতা ও আসক্তির সর্বতোভাবে ত্যাগ

গৃহ, সম্পদ ও বস্ত্রাদি সকল বস্তু এবং স্ত্রী, পুত্র ও মিত্রাদি সম্পূর্ণ বান্ধবজন এবং সম্মান প্রতিষ্ঠা আদি ইহলোকের ও পরলোকের যত বিষয় ভোগরূপ বস্তু আছে, সেই সবই ক্ষণভঙ্গুর ও বিনাশশীল হওয়ায় অনিত্য মনে করে তাতে মমতা ও আসক্তি না থাকা এবং একমাত্র পরমাত্মাতে অনন্য বিশুদ্ধ প্রেম ধারণ হেতু কায়মনোবাক্যে কৃত সকল ক্রিয়া এবং দেহের প্রতি মমতা ও আসক্তির সর্বতোভাবে অভাব হয়ে যাওয়া ; এটি হল ষষ্ঠ পর্যায়ের ত্যাগ।

উক্ত ষষ্ঠ পর্যায়ের ত্যাগী ব্যক্তির জগতের সকল বস্তুতে বৈরাগ্য হয়ে কেবল এক পরমপ্রেমময় ভগবানেই অনন্য প্রেম হয়ে যায়। তাই তার ভগবানের গুণ, প্রভাব ও রহস্যপূর্ণ প্রেম বিষয়ের কথা শোনা, বলা ও মনন করা এবং একান্তে থেকে সতত ভগবানের ভজন ধ্যান ও শাস্ত্রমর্ম বিচার করা প্রিয়বোধ হয়। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বাস করে হাস্য, বিলাস, প্রমাদ, নিন্দা, বিষয়ভোগ ও ব্যর্থ বার্তাদিতে নিজ অমূল্য সময়ের এক ক্ষণও ব্যয় করা তার ভালো লাগে না এবং তার দ্বারা সম্পাদিত সম্পূর্ণ কর্তব্যকর্ম ভগবানের স্বরূপ ও নাম স্মরণে রেখে অনাসক্তভাবে ঈশ্বরের প্রসন্নতা হেতু হয়ে থাকে।

এটি হল কর্মযোগের সাধনা ; এই সাধনায় রত থেকে সাধক পরমাত্মার

কৃপায় পরমাত্মার স্বরূপকে তত্ত্বত জেনে অবিনাশী পরমপদ লাভ করে (১৮।৫৬)।

কিন্তু যদি কেউ সাংখ্যযোগ দ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করতে চায় তাহলে তাকে উক্ত সাধনার পর নিম্নলিখিত সপ্তম পর্যায়ের প্রণালী অনুসারে সাংখ্যযোগের সাধনা করা উচিত।

(৭) জগৎ, শরীর ও সম্পূর্ণ কর্মে সূক্ষ্ম বাসনা এবং অহংকারের সর্বতোভাবে ত্যাগ—

জগতের সম্পূর্ণ পদার্থ মায়ার সৃষ্টি হওয়ায় সর্বতোভাবে অনিত্য এবং একমাত্র সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাই সর্বত্র সমভাবে পরিপূর্ণ—এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় হয়ে শরীরসহ জগতের সম্পূর্ণ পদার্থে ও কর্মে সূক্ষ্ম বাসনার সতত অভাব হয়ে যাওয়া অর্থাৎ অন্তঃকরণে সংস্কাররূপেও তার চিত্র না থাকা এবং শরীরে অহংভাবের সর্বতোভাবে অভাব হয়ে কায়মনোবাক্যে কৃত কর্মসমূহে কর্তৃত্বের অভিমানের লেশমাত্র না থাকা তথা শরীরসহ সকল পদার্থে ও কর্মে বাসনা ও অহংকারের একান্ত অভাব হয়ে একমাত্র সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার স্বরূপেই সুদৃঢ় ভাবে সতত প্রতিষ্ঠিত থাকা—এই হল সপ্তম পর্যায়ের ত্যাগ।

এইরূপ সাধনার ফলে সেই ব্যক্তি তৎকালে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাকে সুখপূর্বক লাভ করে (৬।২৮)। কিন্তু যে ব্যক্তি উক্ত ভাবে কর্মযোগের সাধনা না করে প্রারম্ভেই সাংখ্যযোগের সাধনায় নিযুক্ত হয়, তাকে ঈশ্বরলাভের পথে বিশেষ ক্লেশ অনুভব করতে হয়।

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ। (গীতা ৫।৬)

এইখানে এই প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক যে কোনো সাধক একসঙ্গে উভয় প্রকারের সাধনা করতে পারে কি না ? এর উত্তর হল—সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ—এই দুই সাধনার সম্পাদন একসঙ্গে কারো দ্বারা করা সম্ভব হয় না ; কেননা কর্মযোগী সাধনকালে কর্মকে, কর্মফলকে, পরমাত্মাকে এবং নিজেকে ভিন্ন ভিন্ন মেনে কর্মফল এবং আসক্তির ত্যাগ করে ঈশ্বরার্থে অথবা ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম সম্পাদন করে (৩।৩০ ; ৫।১০ ; ১১।৫৫ ; ১২।১০ ; ১৮।৫৬-৫৭) আর সাংখ্যযোগী মায়াসৃষ্ট সম্পূর্ণ গুণই গুণে প্রবৃত্ত হয়

অথবা ইন্দ্রিয়সকল ইন্দ্রিয়ের অর্থে প্রবৃত্ত—এই ভেবে কায়মনোবাক্যে কৃত সম্পূর্ণ ক্রিয়াতে কর্তৃত্বাভিমানরহিত হয়ে কেবল সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার স্বরূপে অভিন্নভাবে অবস্থান করে (৩।২৮ ; ৫।১৩ ; ১৩।২৯ ; ১৪।১৯-২০ ; ১৮।৪৯-৫৫)। কর্মযোগী নিজেকে কর্মের কর্তা মনে করে (৫।১১), সাংখ্যযোগী নিজেকে কর্তা মানে না (৫।৮,৯)। কর্মযোগী কর্মকে ভগবানে অর্পণ করে (৯।২৭, ২৮), সাংখ্যযোগী মন ও ইন্দ্রিয় দ্বারা কৃত অহংকাররহিত ক্রিয়াসমূহকে কর্ম বলে মানে না (১৮।১৭)। কর্মযোগী পরমাত্মাকে নিজের থেকে পৃথক ভাবে (১২।১০), সাংখ্যযোগী নিজেকে সতত অভেদ জ্ঞান করে (১৮।২০)। কর্মযোগী প্রকৃতি ও ঈশ্বরের ভিন্ন সত্তা স্বীকার করে (১৮।৬১), সাংখ্যযোগী একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন কারও সত্তা স্বীকার করে না (১৩।৩০)। কর্মযোগী কর্মফল এবং কর্মের সত্তা স্বীকার করে, সাংখ্যযোগী ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন কর্ম ও তার ফলের সত্তা স্বীকার করে না এবং তার সঙ্গে নিজের কোনো সম্বন্ধও মানে না। এইভাবে উভয়ের সাধনা প্রণালী ও স্বীকৃতিতে পূর্ব-পশ্চিমসম প্রভেদ বর্তমান। এমন অবস্থায় উভয় নিষ্ঠার সাধনা এক ব্যক্তি একই সময়ে কী ভাবে করবে ? কিন্তু যেমন কোনো ব্যক্তি যদি ভারত থেকে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে যেতে চায় তাহলে সে যদি সঠিক পথে অনবরত পূর্ব দিকে যেতে থাকে তাহলে সে আমেরিকা পৌঁছে যাবে আর যদি শুধুমাত্র পশ্চিম দিকেও যেতে থাকে তাহলেও সে আমেরিকা পৌঁছে যাবে ; তেমনই সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগের সাধনা প্রণালীতে অমিল থাকলেও যে ব্যক্তি কোনো এক সাধনপথে সুদৃঢ় ভাবে যুক্ত থাকে, সে উভয়মার্গের পরমলক্ষ্য সেই একই পরমাত্মাকে লাভ করে (গীতা ৫।৪)।

অধিকারী

এখন প্রশ্ন ওঠে যে গীতোক্ত সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগের অধিকারী কে ? সকল বর্ণের ও সকল আশ্রমের তথা সকল জাতির লোক কি তা আচরণ করতে পারে অথবা কোনো বিশেষ বর্ণ, বিশেষ আশ্রম ও বিশেষ জাতির পক্ষে তা করা সম্ভব ? এর উত্তর হচ্ছে যদিও গীতায় যে পদ্ধতি নিরূপণ করা

আছে তা সতত ভারতীয় ও ঋষিসেবিত, তবুও গীতার শিক্ষায় বিচার করে বলা যায় যে গীতায় কথিত সাধনা অনুসারে আচরণ করবার অধিকার মানব মাত্রেরই আছে। জগদ্‌গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ সকল মানবজাতির উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য—কোনো বিশেষ বর্ণ অথবা আশ্রমের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। এইখানেই গীতার বিশেষত্ব। ভগবান নিজ উপদেশে বিভিন্ন স্থানে **'মানবঃ', 'নরঃ', 'দেহভৃৎ', 'দেহী'** আদি শব্দ প্রয়োগ করে মানুষ মাত্রকেই তার অধিকারী বলেছেন। ভগবান গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে সাংখ্যযোগের মুখ্য সাধনার বর্ণনাকালে মনুষ্যমাত্রকে **'দেহী'** সম্বোধন করে তাদের সাংখ্যযোগের অধিকারী জানিয়েছেন। এইভাবে অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছেচল্লিশতম শ্লোকে ভগবান স্পষ্ট কথায় বলেছেন যে মানবমাত্রই নিজ নিজ শাস্ত্রবিহিত কর্মদ্বারা সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের পূজা করে সিদ্ধিলাভ করতে পারে। এইভাবে ভক্তির ক্ষেত্রে তিনি স্ত্রী, শূদ্র ও পাপযোনি পর্যন্ত সকলকেই অধিকারী জানিয়েছেন (৯।৩২)। অন্যত্রও ভগবান যেখানেই কোনো সাধনার উপদেশ দিয়েছেন সেইখানে এমন বলা হয়নি যে এই সাধনায় কোনো বিশেষ বর্ণ, আশ্রম অথবা জাতির অধিকার আছে, অন্যদের নেই।

তা সত্ত্বেও এই কথা মনে রাখা উচিত যে সকল কর্মের সম্পাদন সকলের জন্য উপযুক্ত ও প্রযোজ্য হয় না। তাই ভগবান বর্ণধর্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যে বর্ণের জন্য যে কর্ম বিহিত, তাদের জন্যই সেই কর্ম কর্তব্য, অন্য বর্ণের জন্য নয়। এই কথাকে মনে রেখেই কর্ম করা উচিত। মনুষ্যমাত্রই এমন বর্ণধর্ম দ্বারা নির্ধারিত কর্তব্যকর্মকে নিজ নিজ অধিকার এবং রুচি অনুসারে যোগনিষ্ঠা অনুযায়ী পালন করতে পারে। বর্ণধর্ম অতিরিক্ত মানবমাত্রের জন্য পালনীয় সদাচার ভক্তি আদির সাধনা তো সকলেই করতে পারে।

কিছু লোকের মতে সাংখ্যযোগের অধিকার সন্ন্যাসীদেরই আছে, অন্য আশ্রমের নেই। এই কথাও যুক্তিসংগত বলে মনে হয় না। অধ্যায় ২।১৮-এ ভগবান সাংখ্যের দৃষ্টিতেও যুদ্ধ করবার আদেশ দিয়েছেন। ভগবান যদি কেবল সন্ন্যাসীদেরই সাংখ্যযোগের অধিকারী মনে করতেন তাহলে তিনি

অর্জুনকে সাংখ্যযোগের দৃষ্টিতে যুদ্ধ করবার আদেশ কখনো দিতেন না কারণ সন্ন্যাস আশ্রমে যখন বাহ্যিকভাবে কর্মমাত্রের ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে তাহলে যুদ্ধরূপ ঘোর কর্মের আর কী কথা ? আর অর্জুন তো সন্ন্যাসীও ছিলেন না। ভগবান অর্জুনকে জ্ঞানীদের কাছে গিয়ে জ্ঞান অর্জনের কথাও বলেছেন (গীতা ৪।৩৪)।

তা ছাড়া তৃতীয় অধ্যায়ে চতুর্থ শ্লোকে ভগবান শুধুমাত্র কর্ম ত্যাগ করলেই সাংখ্যযোগের সিদ্ধি হয় না বলে জানিয়েছেন। যদি ভগবান কেবল সন্ন্যাসীদেরই সাংখ্যযোগের অধিকারী মানতেন তাহলে সাংখ্যযোগের ক্ষেত্রে কর্মত্যাগ করাকে আবশ্যক বলে জানাতেন এবং একথা কখনো বলতেন না যে, কর্ম ত্যাগ করলেই সাংখ্যযোগে সিদ্ধি হয় না। কেবল তাই নয় ; অধ্যায় ১৩।৭-১৩-তে যেখানে জ্ঞানের সাধনা বলা হয়েছে সেইখানে স্ত্রী, পুত্র, ধনসম্পদ, গৃহ আদিতে আসক্তি ও মমতা ত্যাগকেও একটি সাধন বলে জানিয়েছেন—**'অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু'**।

স্ত্রী, পুত্র, গৃহ আদির প্রতি সম্পর্ক স্থাপিত হলে তবেই তাদের প্রতি আসক্তি ও মমতা ত্যাগের কথা বলা হতে পারে। সন্ন্যাসী আশ্রমে এগুলির প্রতি স্বরূপত অর্থাৎ বাহ্যিক ভাবেও বিচ্ছেদ থাকে ; এই অবস্থায় যদি কেবলমাত্র সন্ন্যাসীদেরই জ্ঞানযোগের অধিকারী মনে করা হত তাহলে তাদের জন্য এদের প্রতি আসক্তি ও মমতা ত্যাগের কথা বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

তৃতীয় কথা এই যে ১৮ অধ্যায়ে যেখানে অর্জুন বিশেষ ভাবে সন্ন্যাস ও ত্যাগ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন সেখানে ভগবান ১৩-৪০ শ্লোকগুলিতে সন্ন্যাসের নামে সাংখ্যযোগেরই বর্ণনা করেছেন, সন্ন্যাস আশ্রমের কথা কোথাও উল্লেখ করেননি। যদি 'সন্ন্যাস' শব্দের দ্বারা সন্ন্যাস-আশ্রমের লক্ষ্য থাকত অথবা কেবল সন্ন্যাসীদেরই সাংখ্যযোগের অধিকারী মনে করা হত তাহলে এই প্রসঙ্গে অবশ্যই তার স্পষ্ট কথায় তা উল্লেখ থাকত। এইসব কথায় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে সাংখ্য সাধনার অধিকার সন্ন্যাসী, গৃহস্থ —সকলেরই সমানভাবে আছে। অবশ্য এটা ঠিক যে সাংখ্যযোগের সাধনা করবার জন্য সন্ন্যাসাশ্রমে সুবিধা বেশি, সেই দৃষ্টিতে সাংখ্যযোগ সাধনার

জন্য সন্ন্যাস আশ্রমকে গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষা অধিক প্রশস্ত বলা যেতে পারে।

কর্মযোগের সাধনায় কর্মের প্রাধান্য আছে এবং স্ববর্ণোচিত বিহিতকর্ম করবার জন্য বিশেষরূপে আদেশ প্রদত্ত হয়েছে (গীতা ৩।৮) ; বরং বাহ্যিকরূপে কর্ম ত্যাগকে বাধক বলা হয়েছে (৩।৪)। তাই সন্ন্যাসাশ্রমে দ্রব্যসাধ্য কর্মযোগের আচরণ হতে পারে না কারণ সেখানে দ্রব্য ও কর্মের বাহ্যিকভাবেও ত্যাগ আছে ; কিন্তু ভগবানের ভক্তি সকল আশ্রমেই করা যেতে পারে। কিছু লোকের মনে এই ভ্রম বর্তমান যে, গীতা কেবল সাধু-সন্ন্যাসীদের জন্য, গৃহস্থের জন্য নয় ; তাই তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বালকদের এই ভয়ে গীতা পড়াতে আগ্রহী হন না যে তা পড়ে তারা হয়ত গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করে বসবে। কিন্তু তাদের এমন চিন্তা সর্বতোভাবে ভুল—তা উপরোক্ত কথা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। তারা ভাবেন না যে, মোহগ্রস্ত ক্ষত্রিয়ধর্ম বিমুখ হয়ে ভিক্ষান্নে জীবন ধারণে উদ্যত অর্জুনকে যে পরম রহস্যময় গীতা উপদেশে আজীবন গৃহস্থ থেকে কর্তব্য পালন করিয়েছে, সেই গীতাশাস্ত্রের এই বিপরীত পরিণাম কেমন ভাবে হতে পারে ? তাই নয়, গীতা উপদেষ্টা স্বয়ং ভগবান যতদিন পর্যন্ত ধরাধামে অবতাররূপে ছিলেন ততদিন পর্যন্ত তিনি কর্মে রত ছিলেন—সাধুদের রক্ষা করলেন, দুষ্টদের সংহার করে উদ্ধার করলেন এবং ধর্মস্থাপন করলেন। তাই নয়, তিনি এত দূর বলেছেন যে, যদি আমি সাবধান হয়ে কর্ম না করি তাহলে লোকেরা আমার অনুকরণ করে কর্ম ত্যাগ করে আলস্যযুক্ত হয়ে যাবে এবং এইভাবে লোক-মর্যাদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার দায়িত্ব আমার উপর বর্তাবে (৩।২৩, ২৪)। আবার এর অর্থ এও নয় যে গীতা সন্ন্যাসীদের জন্য নয়। গীতা তো সকল বর্ণাশ্রমের লোকেদের জন্য। সকলেই নিজ নিজ বর্ণাশ্রমের কর্মসকল সম্পাদন করে সাংখ্য বা যোগ—এই দুইয়ের মধ্যে কোনো একটিতে নিষ্ঠাপূর্বক রত থেকে সাধনা করতে পারেন।

গীতায় ভক্তি

গীতায় কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান—সকল বিষয়ের বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে ; সকল পথের পথিকদের জন্য এতে যথেষ্ট সামগ্রী আছে। কিন্তু

অর্জুন ভগবানের ভক্ত ছিলেন ; অতএব সকল বিষয়ের প্রতিপাদন করে যেখানে অর্জুনকে ভগবান স্বয়ং আচরণ করতে আদেশ দিয়েছেন সেইখানে তাঁকে ভক্তিপ্রধান কর্মযোগের উপদেশই দিয়েছেন (৩।৩০ ; ৮।৭ ; ১২।৮ ; ১৮।৫৭, ৬২, ৬৫, ৬৬)। কোথাও কোথাও কেবল কর্ম করার জন্য আদেশ দিয়েছেন (২।৪৮, ৫০ ; ৩।৮, ৯, ১৯ ; ৪।৪২ ; ৬।৪৬ ; ১১।৩৩-৩৪)। কিন্তু তার সঙ্গে প্রসঙ্গ অনুযায়ী অন্য স্থলে কথিত ভক্তিরও সমাহার করে নেওয়া উচিত। কেবল ৪।৩৪-এ ভগবান অর্জুনকে জ্ঞানীদের কাছে গিয়ে জ্ঞান অর্জন করবার আদেশ দিয়েছেন, তাও জ্ঞান লাভ করবার প্রণালী বলবার ও অর্জুনকে সাবধান করবার জন্য। বস্তুত ভগবানের উদ্দেশ্য অর্জুনকে জ্ঞান শিক্ষার জন্য কোনো জ্ঞানীর কাছে পাঠানোর ছিল না আর অর্জুনও সেই প্রক্রিয়ায় কোথাও জ্ঞান শিক্ষা নেননি। উপক্রম-উপসংহার লক্ষ্য করলে শরণাগতিই গীতার উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। এমনিতে তো গীতার উপদেশ **'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্'** (২।১১) শ্লোকের মাধ্যমে আরম্ভ হয়েছে কিন্তু এই উপক্রমের বীজ **'কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ'** (২।৭)—অর্জুনের এই উক্তিতে আছে যাতে **'প্রপন্নম্'** পদে শরণাগতির ভাব প্রকাশ পায়। তাই **'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য'** (১৮।৬৬)—এই শ্লোকের মাধ্যমে শরণাগতিতেই ভগবান উপদেশের উপসংহার করেছেন।

গীতায় এমন কোনো অধ্যায় নেই যাতে কোনো-না-কোনোভাবে ভক্তিপ্রসঙ্গের উল্লেখ হয়নি। উদাহরণরূপে ২।৬১ ; ৩।৩০ ; ৪।১১ ; ৫।২৯ ; ৬।৪৭ ; ৭।১৪ ; ৮।১৪ ; ৯।৩৪ ; ১০।৯ ; ১১।৫৪ ; ১২।২ ; ১৩।১০ ; ১৪।২৬ ; ১৫।১৯ ; ১৬।১ (যাতে **জ্ঞানযোগ-ব্যবস্থিতিঃ** পদ দ্বারা ভগবান ধ্যানের কথা বলেছেন) ; ১৭।২৭, ১৮।৬৬ শ্লোক দেখুন। এইভাবে প্রত্যেক অধ্যায়ে ভক্তিপ্রসঙ্গ এসেছে। সাত থেকে বারো অধ্যায়ে তো ভক্তিযোগের প্রকরণ ভরা আছে ; এই ছয় অধ্যায়কে ভক্তিপ্রধান বলা হয়। এইখানে উদাহরণ হিসেবে প্রত্যেক অধ্যায়ে একটি করে শ্লোকের উল্লেখ করা হয়েছে। এইভাবে জ্ঞান-বিষয়ক শ্লোকও প্রায় প্রতি অধ্যায়ে পাওয়া যায়, উদাহরণরূপে ২।২৯ ; ৩।২৮ ; ৪।২৫ (উত্তরার্ধ) ; ৫।১৩ ; ৬।২৯ ; ৮।১৩ ; ৯।১৫ ; ১২।৩ ; ১৩।৩৪ ;

১৪।১৯ ; ১৮।৪৯ শ্লোক দেখুন। এ ক্ষেত্রেও দ্বিতীয়, পঞ্চম, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে জ্ঞান বিষয়ক বহু শ্লোক বলা হয়েছে।

গীতাতে যেভাবে ভক্তি ও জ্ঞানের রহস্য উন্মোচিত হয়েছে তদনুরূপ ভাবে কর্মের রহস্যও উত্তমরূপে বিমোচিত হয়েছে। গীতার ২।৩৯-৫৩ ; ৩।৪-৩৫ ; ৪।১৩-৩২ ; ৫।২-৭ ; ৬।১-৪ শ্লোক পর্যন্ত কর্মরহস্য পূর্ণরূপে নিহিত আছে। এতেও অধ্যায় ২।৪৭-এ কর্মের ও ৪।১৬-১৮-এ কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্ম নামে কর্মের রহস্য বিশেষরূপে বিবেচিত হয়েছে। গীতা তত্ত্ববিবেচনীতে উপর্যুক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে গীতায় শুধু ভক্তিরই বর্ণনা হয়নি, বরং জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি—তিনেরই সম্যকভাবে প্রতিপাদন করা হয়েছে।

সগুণ-নির্গুণ তত্ত্ব

পূর্বে বলা হয়েছে যে পরমাত্মার উপাসনা ভেদ অথবা অভেদ দৃষ্টিতে করলে দুইয়ের একই ফল লাভ হয়—'**যৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে**' (৫।৫)—এই কথা কী করে বলা হল ? ভেদোপাসককে ভগবান সাকাররূপে দর্শন দেন এবং দেহত্যাগের পর সে তাঁরই পরমধামে গমন করে ; আর অভেদোপাসক স্বয়ং ব্রহ্মরূপ হয়ে যায়, তার কোথাও গমনাগমন হয় না। তাহলে এটা কেমন ভাবে বলা যায় যে উভয় প্রকারের উপাসনায়—সাংখ্যনিষ্ঠা ও যোগনিষ্ঠার ফল একই হয় ? তার উত্তর এই যে উপরে বলা কথাও ঠিক এবং প্রশ্নকর্তা যে কথা বলেছে তাও ঠিক। দুইয়ের সমন্বয় কেমন করে হয় এখন সেই বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

সাধনকালে সাধক যে ভাব ও শ্রদ্ধা সহকারে পরমাত্মার উপাসনা করে তার তেমন ভাব অনুসারেই ঈশ্বর লাভ হয়। ভগবান নিজেও বলেন— 'যে আমাকে যেমন ভাবে ভজনা করে, আমি তাকে সেই ভাবেই ভজনা করি (৪।১১)।' যে অভেদরূপে অর্থাৎ নিজেকে পরমাত্মা থেকে অভিন্ন জেনে তাঁর উপাসনা করে তার অভেদরূপে ঈশ্বর লাভ হয় ; আর যে ভেদরূপে ভজনা করে তাকে ভেদরূপেই তিনি দর্শন দেন। সাধকের নিষ্ঠা অনুসারে ভগবান ভিন্ন ভিন্ন রূপে সেইসকল সাধকদের দর্শন দেন।

ভেদোপাসনা ও অভেদোপাসনা—উভয়ই ভগবানের উপাসনা ; কারণ ভগবান সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার, ব্যক্ত-অব্যক্ত সব কিছুই। যে ব্যক্তি ভগবানকে নির্গুণ-নিরাকার মনে করে তার জন্য তিনি নির্গুণ নিরাকার (১২।৩ ; ১৩।১২)। যে তাঁকে সগুণ-নিরাকার ভাবে তার জন্য তিনি সগুণ-নিরাকার (৮।৯)। যে তাঁকে সর্বশক্তিমান, সর্বাধার, সর্বব্যাপী, সর্বোত্তম আদি উত্তম গুণযুক্ত মানে তার জন্য তিনি সর্বসদ্‌গুণসম্পন্ন (১৫।১৫, ১৩, ১৯)[১]। যে ব্যক্তি তাঁকে সর্বরূপ মানে তার জন্য তিনি সর্বরূপ (৭।৭-১২ ; ৯।১৬-১৯)। যে তাঁকে সগুণ-সাকার মনে করে তিনি তাকে সগুণ সাকাররূপেই দর্শন দেন (৪।৮ ; ৯।২৬)।

উপরে যে কথা বলা হয়েছে তা তো ঠিকই আছে কিন্তু এর দ্বারা প্রশ্ন কর্তার মূল সমস্যার সমাধান হল না ; তা পূর্ববৎ রয়ে গেল। মূল প্রশ্ন করা হয়েছিল যে ভগবান সকলকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা দেন তাহলে ফলে একত্ব কোথায় হল ? এর উত্তর এই যে প্রথমে ভগবান সাধককে তার ভাব অনুসারেই দেখা দেন। তারপর যখন ভগবানের যথার্থ তত্ত্বের উপলব্ধি হয় তা অকথনীয় অর্থাৎ তা বলে প্রকাশ করা যায় না। ভেদ অথবা অভেদরূপে যত ভাবে ভগবানের উপাসনা হয় সেই সকলের অন্তিম ফল একই হয়। এই কথাকে বোঝাবার জন্য ভগবান কোথাও কোথাও অভেদোপাসককে নিজের প্রাপ্তি বলেছেন (১২।৪ ; ১৪।১৯ ; ১৮।৫৫) আর ভেদোপাসকের জন্য বলেছেন যে সে ব্রহ্ম লাভ করে (১৪।২৬), অনাময় পদ লাভ করে (২।৫১), শাশ্বত শান্তি লাভ করে (৯।৩১), ব্রহ্মকে জানতে পারে (৭।২৯), অবিনাশী শাশ্বত পদ লাভ করে (১৮।৫৬) ইত্যাদি। ভেদোপাসনা ও অভেদোপাসনা—উভয় প্রকারের উপাসনার ফল একই হয়—এই কথাকে লক্ষ্য করে ভগবান একটাই কথা নানা ভাবে বলেছেন। ভেদোপাসক ও অভেদোপাসক উভয়ের দ্বারা লভ্য বস্তু, যথার্থ তত্ত্ব অথবা

---

[১]উল্লিখিত শ্লোকগুলিতে ভগবানের শ্রেষ্ঠ গুণসকলের বর্ণনা আছে, সেইজন্য 'অপোহন' শব্দের অর্থ জ্ঞান ও স্মৃতিনাশ না নিয়ে সংশয়-বিপর্যয়ের নাশ নেওয়া হয়েছে।

'স্থান' একই (৫।৫) ; তাকেই কোথাও পরম শান্তি ও শাশ্বত বলা হয়েছে (১৮।৬২), কোথাও পরমধাম নামে (১৫।৬), কোথাও অমৃত নামে (১৩।১২), কোথাও **'মাম্'** পদে (৯।৩৪), কোথাও পরমগতি নামে (৮।১৩), কোথাও পরম সংসিদ্ধি নামে (৮।১৫), কোথাও অব্যয়পদ নামে (১৫।৫), কোথাও ব্রহ্মনির্বাণ নামে (৫।২৪), কোথাও নির্বাণপরমা শান্তি নামে (৬।১৫) এবং কোথাও নৈষ্ঠিক শান্তি নামে (৫।১২) ব্যক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া গীতায় আরও কতকগুলি শব্দ অন্তিম ফলকে ব্যক্ত করবার জন্য প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু তা সকল সাধনার ফল—এর বেশি সেই সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। তা বাণীর বিষয় নয়। যে তাঁকে লাভ করেছে সেই তা জানে কিন্তু সেও তার বর্ণনা করতে পারে না ; উপরোক্ত শব্দে তথা অন্যান্য বাক্যের মাধ্যমে শাখাচন্দ্রন্যায়ের মত তাঁর লক্ষ্যমাত্র করাতে পারে। তাই সকল সাধনার ফলরূপ যে পরমতত্ত্ব আছে তা অভিন্ন, এই কথাই যুক্তিসংগত।

ভগবানের এই তাত্ত্বিক স্বরূপ অলৌকিক; পরম রহস্যময় ও গুহ্যতম। যে সেটি উপলব্ধি করেছে সেই তা জানে। কিন্তু এই কথাও তাঁকে লক্ষ্য করাবার উদ্দেশ্যেই বলা হয়ে থাকে। যুক্তি দিয়ে দেখলে তো তাও বলা সম্ভব হয় না।

গীতায় সমতা

গীতায় সমতার কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। ভগবৎ প্রাপ্তিতে সমতাই প্রধান বিবেচ্য। জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তি—তিন পথে সাধনারূপেও সমতার প্রয়োজনীয়তা বলা হয়েছে এবং ওই তিন পথেই যাঁরা ঈশ্বর লাভ করেছেন তাঁদের ক্ষেত্রে সমতাকে এক অসাধারণ লক্ষণ বলা হয়েছে। সমতা ছাড়া সাধনা অসম্পূর্ণ থাকে, আর সিদ্ধাবস্থায় সমতা পূর্ণরূপে থাকবে—এতে বলার কী আছে ! যাঁর সমতা নেই তিনি কখনো সিদ্ধপুরুষ নন। অধ্যায় ২।১৫-তে **'সমদুঃখসুখম্'** পদে জ্ঞানপথের সাধকদের মধ্যে সমতালাভকারীকেই অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তির অধিকারী বলা হয়েছে। অধ্যায় ২।৪৮-এ **'সিদ্ধসিদ্ধয়োঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে'**—এই শ্লোকটি দ্বারা কর্মযোগের সাধককে সমতাযুক্ত হয়ে কর্ম করবার আদেশ দেওয়া

হয়েছে। অধ্যায় ১২।১৮, ১৯—এই দুই শ্লোকে ভক্তের লক্ষণে সমতার উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেই অধ্যায়ের ২০ শ্লোকে ভক্তিমার্গের সাধকের জন্যও সেই গুণের অর্থাৎ সমতা অর্জনের কথা বলা হয়েছে। এইভাবে ৬।৭-৯-এ সিদ্ধ কর্মযোগীকে সম বলা হয়েছে এবং অধ্যায় ১৪।২৪, ২৫-এ গুণাতীত (সিদ্ধ জ্ঞানযোগী)র লক্ষণেও সমতার কথা প্রধানভাবে লক্ষ্য করা যায়।

এই সমত্ব-তত্ত্ব সহজ সরল ভাবে উত্তম রূপে বোঝাবার জন্য শ্রীভগবান গীতায় সমস্ত ক্রিয়া, ভাব, পদার্থ এবং ভূতপ্রাণীদের প্রতি সমভাবের কথা জানিয়েছেন। যেমন—

মানুষে সমতা

সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু ।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে।।

(গীতা ৬।৯)

'সুহৃদ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, ধর্মাত্মা এবং পাপীদের উপরে যিনি সমভাব রাখেন তিনিই প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ ।'

মানুষ এবং পশুতে সমতা

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।

(গীতা ৫।১৮)

'ব্রহ্মজ্ঞানীগণ বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণে, গো, হস্তী, সারমেয় ও চণ্ডালে সমদর্শী হন।'

সম্পূর্ণ জীবের প্রতি সমতা

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।।

(গীতা ৬।৩২)

'হে অর্জুন ! যিনি সর্বত্র সমদর্শী এবং সর্বভূতের সুখ ও দুঃখকে নিজ সুখ ও দুঃখ বলে অনুভব করেন, আমার মতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।'

কোথাও কোথাও ভগবান ব্যক্তি, ক্রিয়া, পদার্থ এবং ভাবের সমতাকে একসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। যেমন—

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ॥

(গীতা ১২।১৮)

'যিনি শত্রু ও মিত্রে, মান ও অপমানে সমবুদ্ধি, শীত ও উষ্ণ এবং সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বে নির্বিকার ও আসক্তিশূন্য (তিনিই ভক্ত)।'

এইখানে 'শত্রু-মিত্র' ব্যক্তির বাচক, মান-অপমান অপরের দ্বারা সম্পাদিত ক্রিয়ার বাচক ও শীত-উষ্ণ পদার্থ এবং সুখ-দুঃখ ভাবের বাচক।

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥

(গীতা ১৪।২৪)

'যিনি নিরন্তর আত্মভাবে স্থিত, সুখ-দুঃখে সমবুদ্ধি, মৃত্তিকা-প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমভাববিশিষ্ট, জ্ঞানী, প্রিয় ও অপ্রিয়ে সমজ্ঞানযুক্ত, নিন্দা ও স্তুতিতে সমভাবাপন্ন—সেই ধীর ব্যক্তি হলেন গুণাতীত।'

এতেও সুখ-দুঃখ হল 'ভাব', লোষ্ট, অশ্ম (পিণ্ড) এবং কাঞ্চন হল পদার্থ, নিন্দা-স্তুতি হল পরকৃত ক্রিয়া এবং প্রিয়-অপ্রিয় প্রাণী, ভাব, পদার্থ ও ক্রিয়া—সমস্ত কিছুর বাচক।

এইভাবে যে সর্বত্র সমদৃষ্টি, ব্যবহারে কথনমাত্রের অহংকার মমতা থাকলেও যে সর্ববস্তুতে সমবুদ্ধি রাখে, যার সমষ্টিরূপ সমস্ত জগতে আত্মভাব সেই সমতাযুক্ত ব্যক্তি এবং সেই প্রকৃত সাম্যবাদী।

গীতা বর্ণিত সাম্যবাদ ও আজকের বলা সাম্যবাদে অনেক তফাত আছে। আধুনিক সাম্যবাদ ঈশ্বর বিরোধী আর গীতার সাম্যবাদ সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন করায় ; সেটি ধর্মনাশক আর ইহা পদে পদে ধর্মের পুষ্টি করে ; তা হিংসাময় ও এটি অহিংসার প্রতিপাদক ; আধুনিক সাম্যবাদ স্বার্থমূলক আর গীতার সাম্যবাদ স্বার্থকে কাছে ঘেঁষতেও দেয় না ; সেটি খাওয়া-পান করা-স্পর্শাদিতে উপর থেকে ভেদাভেদ না রেখে ভিতরে ভেদভাব রাখে আর এটি খাওয়া, পান করা, স্পর্শাদিতে শাস্ত্রমর্যাদা অনুসারে যথাযোগ্য ভেদ

রেখেও আন্তরিক ভেদ রাখে না এবং সকলের মধ্যে আত্মাকে অভিন্ন দর্শন করবার শিক্ষা দেয় ; আধুনিক সাম্যবাদের লক্ষ্য কেবল সম্পদের উপাসনা আর এটির লক্ষ হল ঈশ্বরপ্রাপ্তি ; তাতে নিজেদের জনবল নিয়ে অহং-অভিমান, দলের অহংকার ও অপরের অনাদর করা হয় আর এতে সতত অহংকারশূন্যতা ও সমস্ত জগতে পরমাত্মাকে লক্ষ্য করে সকলের সম্মান করা হয়ে থাকে ; তাতে বাহ্য ব্যবহারের প্রাধান্য থাকে আর এতে অন্তঃকরণের ভাবের প্রাধান্য থাকে ; তাতে লৌকিক সুখ মুখ্য আর এতে আধ্যাত্মিক সুখ মুখ্য ; তাতে পরধন এবং পর মতে অসহিষ্ণুতা থাকে আর এতে সকলের সমান আদর থাকে ; তাতে রাগ-দ্বেষ থাকে, এতে রাগ-দ্বেষ বিরহিত ব্যবহার করা হয়।

জীবের গতি

গীতায় জীবের গুণ এবং কর্মানুসারে তার উত্তম, মধ্যম ও অধম—তিন প্রকারের গতির কথা বলা হয়েছে।

যোগ ও সাংখ্য দৃষ্টিতে শাস্ত্রোক্ত কর্ম এবং উপাসনাকারী সাধকের গতি অধ্যায় ৮।২৪ শ্লোকে বলা আছে। তাতে যে যোগভ্রষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ সাধনার সিদ্ধিলাভের পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় তার গতি অধ্যায় ৬।৪০-৪৫-এ বর্ণনা করা হয়েছে। সেইখানে বলা আছে যে মৃত্যুর পর তারা স্বর্গাদি লোক লাভ করে এবং সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত সেই দিব্যলোকে সুখ ভোগ করে পবিত্র আচরণকারী ব্যক্তির গৃহে জন্ম নেয় অথবা যোগীর কুলেই জন্ম নেয় আর সেইখানে পূর্ব অভ্যাস হেতু আবার সাধনায় প্রবৃত্ত হয়ে পরমগতি লাভ করে।

সকামভাবে বিহিত কর্ম এবং উপাসনাকারীর গতির বিবরণ অধ্যায় ৯।২০, ২১-এ বলা হয়েছে যেখানে স্বর্গ কামনায় যাগযজ্ঞাদি বেদবিহিত কর্মকারীগণকে স্বর্গের ভোগের প্রাপ্তি ও পুণ্য ক্ষয়ে আবার মর্ত্যলোকে প্রেরণ করার কথা বলা হয়েছে। তারা কোন্ পথে ও কীভাবে স্বর্গে যায় তার প্রক্রিয়া অধ্যায় ৮।২৫-এ বলা হয়েছে। গীতা তত্ত্ববিবেচনীতে সবিস্তারে উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করা আছে।

চতুর্দশ অধ্যায়ের ১৪, ১৫ ও ১৮ শ্লোকে সাধারণভাবে সংক্ষেপে

সকল পুরুষের গতি বলা হয়েছে। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতে মৃত্যুবরণকারী উত্তম লোকে যায়, রজোগুণের বৃদ্ধিতে মৃত্যুবরণকারী মানুষরূপে জন্ম নেয়, তমোগুণ বৃদ্ধিতে মৃত্যুবরণকারী পশু-পক্ষী, কীট পতঙ্গ ও বৃক্ষাদি যোনিতে জন্ম নেয়। এই ভাবে মৃত্যুর পর সত্ত্বগুণে স্থিত ব্যক্তি ঊর্ধ্বলোকে, রজোগুণে স্থিত ব্যক্তি মর্ত্যলোকে ও তমোগুণে স্থিত ব্যক্তি অধোগতি অর্থাৎ নরকে এবং তির্যক যোনিতে গমন করে। ষোড়শ অধ্যায় ১৯-২১ শ্লোকে আসুরী প্রকৃতির তামসী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন যে আমি তাদের বারে বারে আসুরী যোনি অর্থাৎ সারমেয়, শূকর আদি যোনিতে নিক্ষেপ করি এবং তারপর তারা ঘোর নরকে পতিত হয়। এইভবে অন্যান্য স্থানেও গুণকর্ম অনুসার গীতায় জীবের গতি বলা হয়েছে। মুক্তপুরুষের গতির বর্ণনা সবিস্তারে সাংখ্য ও যোগের ফলরূপে বলা হয়েছে।

গীতার কয়েকটি বিশেষ কথা

(১) গুণের পরিচয়

গীতায় সাত্ত্বিক-রাজসিক-তামসিক পদার্থ, ভাব এবং ক্রিয়া চিনে নেওয়ার লক্ষণ বলা হয়েছে। তা এইরকম—

(ক) যে সকল পদার্থ, ভাব বা ক্রিয়ার স্বার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না আর যাতে আসক্তি ও মমতা থাকে না ও যার ফল ভগবৎ প্রাপ্তি তাকে সাত্ত্বিক বোঝা উচিত।

(খ) যে সকল পদার্থ, ভাব বা ক্রিয়ায় লোভ, স্বার্থ এবং আসক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে ও যার ফল ক্ষণিক সুখ লাভ এবং অন্তিম পরিণাম দুঃখ তা রাজসিক।

(গ) যে সকল পদার্থ, ভাব বা ক্রিয়ায় হিংসা, মোহ এবং প্রমাদ থাকে ও যার ফল দুঃখ এবং অজ্ঞান হয় তা তামসিক।

এই ভাবে তিন প্রকারের পদার্থ, ভাব ও ক্রিয়ার ভেদের উল্লেখ করে ভগবান সাত্ত্বিক পদার্থ, ভাব এবং ক্রিয়াকে গ্রহণ এবং রাজসিক ও তামসিক পদার্থ, ভাব ও ক্রিয়াকে ত্যাগ করবার কথা বলেছেন।

(২) গীতায় আচরণের চেয়ে ভাবের প্রাধান্য

যদিও গীতায় ভগবান উত্তম আচরণ এবং অন্তঃকরণের উত্তম

ভাব—দুইই কল্যাণের কারণ বলেছেন কিন্তু 'প্রাধান্য ভাবেরই' বলে জানিয়েছেন। দ্বিতীয়, দ্বাদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়ের শেষে ক্রমশ স্থিতপ্রজ্ঞ, ভক্ত এবং গুণাতীত ব্যক্তির লক্ষণে ভাবের প্রাধান্য বলা আছে (দেখুন ২।৫৫-৭১ ; ১২।১৩-১৯ ; ১৪।২২-২৫)। দ্বিতীয় ও চতুর্দশ অধ্যায়ে তো অর্জুন প্রশ্ন করেছেন আচরণকে লক্ষ্য করে কিন্তু ভগবান উত্তর দিয়েছেন ভাবে দৃষ্টি রেখে। গীতা অনুসারে সকামভাবে কৃত যজ্ঞ, দান, তপস্যা আদি উচ্চ ক্রিয়া ও উপাসনার চাইতে নিষ্কামভাবে সম্পাদিত শিল্প, ব্যবসা এবং সেবা আদি ছোট ছোট ক্রিয়াও মুক্তি প্রদায়ক হওয়ায় শ্রেষ্ঠ (২।৪০, ৪৯ ; ১২।১২ ; ১৮।৪৬)। চতুর্থ অধ্যায়ে যেখানে অনেক রকম যজ্ঞরূপ সাধনার কথা বলেছেন তাতেও ভাবের প্রাধান্যতেই মুক্তি লাভের কথা বলা হয়েছে।

গীতা ও বেদ

গীতা বেদকে সম্মান করে। অধ্যায় ১৫।১৫-তে ভগবান নিজেকে সমস্ত বেদ দ্বারা জ্ঞাত, বেদান্তের রচনাকারী ও বেদজ্ঞানী বলে বেদের মাহাত্ম্যের কথা জানিয়েছেন। অধ্যায় ১৫।১-এ জগৎরূপ অশ্বত্থ বৃক্ষকে বর্ণনা করে ভগবান বলেন যে মূলসহিত সেই বৃক্ষকে যে যথার্থভাবে জানে সেই বাস্তবে বেদতত্ত্বজ্ঞানী। এতে ভগবান জানিয়েছেন যে জগতের কারণরূপ পরমাত্মাকে তত্ত্বতঃ ও জগতের বাস্তবিক স্বরূপকে জানানো হল বেদের প্রকৃত তাৎপর্য। অধ্যায় ১৩।৪-এ ভগবান বলেছেন—'যে কথা বেদ দ্বারা বিভাগপূর্বক বলা হয়েছে তাই আমি বলছি।' এইভাবে নিজ উক্তির সমর্থনে বেদকে প্রমাণ বলে ভগবান বেদের মহিমা সুউচ্চ করেছেন। অধ্যায় ৯।১৭-তে ভগবান ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ—বেদত্রয়ীকে নিজ স্বরূপ বলে তাঁর আরও সমাদর করেছেন। অধ্যায় ৩।১৫ এবং ১৭।২৩-এ ভগবান বেদকে নিজের দ্বারা উৎপন্ন বলেছেন এবং অধ্যায় ৪।৩২-এ ভগবান বলেছেন যে, পরমাত্মাকে লাভ করবার জন্য বেদের বহু পথ বলা আছে। এতে যেন ভগবান স্পষ্টরূপে এই বলছেন যে, যেমন কিছু অবিবেকযুক্ত ব্যক্তিগণ ভাবেন সেরূপ বেদে ভোগপ্রাপ্তির বর্ণনাই শুধু নেই বরং ভগবৎপ্রাপ্তির দু-একটা নয়, বেদে বহু সাধন-পথের উল্লেখ আছে।

অধ্যায় ৮।১১-এ পরমপদের নামে নিজ স্বরূপের বর্ণনা করে ভগবান বলেছেন যে বেদবেত্তাগণ তাকে 'অক্ষর' (ওঁকার) নামে নির্দেশ করেন। এতেও ভগবানের বক্তব্য হল যে বেদসমূহে কেবল সকাম পুরুষদ্বারা লব্ধ সুখাদি ও স্বর্গের অনিত্য ভোগের বর্ণনা নেই বরং তাতে ভগবানের অবিনাশী স্বরূপেরও বিশদ বর্ণনা আছে।

উপরের কথায় এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে ভগবান বেদের খুব সমাদর করেন। এই প্রসঙ্গে এই শঙ্কা হয় যে তাহলে কেন ভগবান বেশ কয়েকটি জায়গায় বেদের নিন্দাও করেছেন। উদাহরণ হিসেবে অধ্যায় ২।৪২-এ তিনি সকাম পুরুষকে বেদবাদে রত এবং অবিবেকী বলেছেন। অধ্যায় ২।৪৫-এ তিনি বেদকে ত্রিগুণের কার্যরূপ লৌকিক ভোগ এবং সেগুলির প্রাপ্তির প্রতিপাদনকারী বলে অর্জুনকে সেই ভোগে আসক্তিরহিত থাকতে বলেছেন এবং অধ্যায় ৯।২১-এ বেদত্রয়ধর্ম আশ্রয়কারী সকাম ব্যক্তিদের সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন যে তারা বারে বারে জন্ম নেয় ও মৃত্যু বরণ করে —গতায়াত চক্র থেকে মুক্তি পায় না। এমন পরিস্থিতিতে যথার্থ কোন্‌টি ?

এই শঙ্কার উত্তর এই যে উপরে কথিত কথায় বেদের নিন্দা করা হয়েছে বলে মনে হলেও কিন্তু বাস্তবে তাতে বেদের নিন্দা নেই। গীতায় সকাম ভাবের চেয়ে নিষ্কাম ভাবকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং ঈশ্বর লাভের পথে তাকে আবশ্যক বলা হয়েছে। তাই নিষ্কাম ভাবের চাইতে সকাম ভাবকে নিম্নস্তরের ও বিনাশশীল বিষয় সুখ প্রদানকারী জানাবার জন্য, বিভিন্ন স্থানে তা তুচ্ছ প্রমাণ করেছেন, নিষিদ্ধ কর্মসম তার নিন্দা করা হয়নি। অধ্যায় ৮।২৮-এ যেখানে বেদের ফল অতিক্রম করবার কথা বলা আছে সেখানে সকাম কর্মকে লক্ষ্য রেখে তা বলা হয়েছে। উপরোক্ত আলোচনায় এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে ভগবান গীতায় বেদের নিন্দা কোথাও করেননি বরং স্থানে স্থানে তার প্রশংসাই করেছেন।

গীতা এবং সাংখ্যদর্শন ও যোগদর্শন

কেউ একথাও বলেন যে গীতায় যেখানে যেখানে সাংখ্য শব্দের প্রয়োগ হয়েছে তা বস্তুত মহর্ষি কপিল দ্বারা প্রবর্তিত সাংখ্যদর্শনের বাচক ; কিন্তু তা

যুক্তিসংগত বলে মনে হয় না। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পর পর তিনটি শ্লোকে (১৯, ২০, ২১) ও অন্যত্রও 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ' দুটি শব্দই একসঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং প্রকৃতি-পুরুষ সাংখ্যদর্শনের বিশেষ শব্দ ; তাইতে লোকেরা অনুমান করে নিয়েছে যে গীতা কপিল সাংখ্য সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করেছে। এইভাবে কিছু ব্যক্তি যোগ শব্দও পাতঞ্জলযোগের যোগ শব্দের বাচক বলে মনে করে থাকে। পঞ্চম অধ্যায়ের সূচনায় ও অন্যত্রও বহু স্থানে সাংখ্য ও যোগ শব্দ একসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে ; তাইতেই লোকেদের ধারণা হয়েছে যে সাংখ্য ও যোগ শব্দ ক্রমশ কপিল সাংখ্য ও পাতঞ্জলি যোগের বাচক কিন্তু এই কথা যুক্তিসংগত নয়। গীতার সাংখ্য কপিল-সাংখ্যও নয় আর যোগ পাতঞ্জল যোগও নয়। নিম্নলিখিত কথায় তা স্পষ্ট হয়ে যায়—

(১) গীতায় ঈশ্বরকে যে রূপে মানা হয় সেই রূপে সাংখ্যদর্শন মানে না।

(২) যদিও গীতায় প্রকৃতি শব্দের বহু স্থানে ব্যবহার হয়েছে কিন্তু গীতার প্রকৃতি এবং সাংখ্যের প্রকৃতিতে অনেক প্রভেদ। সাংখ্যে প্রকৃতিকে অনাদি ও অনিত্য মানা হয় ; গীতাও প্রকৃতিকে অনাদি বলেছেন (১৩।১৯) কিন্তু গীতা অনুসারে জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ছাড়া প্রকৃতির অস্তিত্বই নেই।

৩) গীতার পুরুষ ও সাংখ্যের পুরুষেও অনেক প্রভেদ। সাংখ্যমতে পুরুষ অনেক কিন্তু গীতা একটাই পুরুষ মানেন (১৩।৩০ ; ১৮।২০)।

৪) গীতার মুক্তি এবং সাংখ্যের মুক্তিতেও প্রভেদ আছে। সাংখ্য মতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মুক্তির স্বরূপ। গীতায় 'মুক্তি'-তে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি তো আছেই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মা লাভও আছে।

৫) পাতঞ্জল যোগে যোগের অর্থ—চিত্তবৃত্তির নিরোধ। কিন্তু গীতায় প্রকরণানুসার যোগ শব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হয়েছে (দেখুন গীতা তত্ত্ব বিবেচনী, অধ্যায় ২।৫৩ টীকা)।

এইভাবে গীতা এবং সাংখ্যদর্শনের ও যোগদর্শনের সিদ্ধান্তে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

———o———

অর্থ ও প্রভাবসহ কৃত নাম-জপের মহত্ত্ব

প্রাতঃকালীন ও সন্ধ্যাকালীন যে নিত্যকর্ম আমরা করে থাকি তাতে আমাদের প্রভূত উপকার হয়ে থাকে। এতে আমাদের অধিক সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। সাধারণত দেখা যায় যে নিত্যকর্ম সম্পাদনে একটা দায়সারা ভাব থাকে আর তা মনোযোগ সহকারে করা হয় না। এই কারণেই সেই নিত্যকর্মে যে লাভ হওয়ার কথা তা হয় না। চব্বিশ ঘণ্টায় যতবেশী এই নিত্যকর্মে যুক্ত থাকা হয় বস্তুত তাই অতি উত্তম ও পরম পুণ্যফলযুক্ত কাল। দিবা ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে আমরা যে সন্ধ্যা-উপাসনা করি সেটিই ঈশ্বরের উপাসনা। প্রাণায়াম, ধ্যান, জপ, গীতাপাঠ, স্তোত্রপাঠ, স্তুতি প্রভৃতি সবই উপাসনার অঙ্গ। এই উপাসনাই হল ঈশ্বরের পূজা।

সন্ধ্যা-উপাসনাদিতে আমাদের যতটা মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন ততটা আমরা সাধারণত দিই না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তার গভীর সম্বন্ধ আমরা অনুধাবন করতে পারি না। সাধারণত মন সেখানে সায় দেয় না, তাই তা তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলতে ইচ্ছা হয়ে থাকে। দায়সারা ভাবে তা সাঙ্গ করলে সাধারণত আমরা সন্ধ্যা-উপাসনা আদির আনন্দ অনুভূতি থেকে বঞ্চিত থাকি আর প্রকৃত উপাসনা থেকে বহু দূরে অবস্থান করি। এটাকে মনের কুটিল স্বভাব বলা ভালো। এই স্বভাব থাকা ঠিক নয়। সাধারণত এই স্বভাব সকলের মধ্যেই অল্পবিস্তর থাকে। এই নিত্যকর্ম যদি সমাদরে প্রীতিসহকারে করা হয় তাহলে তার লাভ অল্প দিনেই পাওয়া যাবে। উপাসনায় অনুরাগ ও প্রীতিই প্রধান। প্রীতি সহকারে কোনো কিছু সম্পাদন করলে তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয় আর তা স্থায়ী হয়ে শীঘ্র লাভজনক হয়ে যায়। অনুরাগ ও প্রীতি ছাড়া বহু বৎসর উপাসনা করলেও বিশেষ লাভ হতে দেখা যায় না কিন্তু একদিনে এক বেলায় অনুরাগ ও প্রীতি সহকারে অন্তর দিয়ে যে উপাসনা করা হয় তার পরম সুফল অতি শীঘ্রই দেখা যাবে আর তখন অন্তরে এক অপূর্ব আনন্দ ও শান্তির অনুভূতি আসবে।

উপাসনা অন্তর থেকে করা দরকার। ধ্যান, জপ, প্রাণায়াম একাগ্রচিত্তে হচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য রাখা উচিত। নাম-জপ সম সহজ সরল ও মহান ফলদায়ক সাধন অন্য কিছুই নেই। গুপ্ত জপই জপের মধ্যে অধিক ফলপ্রদানকারী হয়ে থাকে। তাই জপ গুপ্ত রাখলে ভালো হয়। জপ যদি লোকেদের সম্মুখে প্রকাশ করা হয় তাহলে তার মাহাত্ম্য খর্ব হয়। কোনো ভাবে এমনকি সংকেত দ্বারাও তা জানাজানি হতে দিতে নেই। এ কথা সতত স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে জপ যতই গুপ্তভাবে করা হবে ততই তা লাভজনক হবে। গুপ্ত জপের ফলও অদ্ভুত হয়ে থাকে। গুপ্ত পাপ ও গুপ্ত পুণ্য—দুইই অধিক ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। গুপ্ত সাধনায় ঈশ্বরের উপর অনুরাগের বৃদ্ধি হয় আর তার ফলে চিত্তে শান্তি ও প্রসন্নতা আসে।

জপ করবার সময়ে তার অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। অর্থের উপর যত বেশি দৃষ্টি থাকবে তত বেশি জপে বিশ্বাস আসবে আর তার দ্বারা প্রচুর আনন্দ অনুভূতি লাভ হবে। উদাহরণের জন্য আমরা এই মন্ত্রের অর্থের উপর দৃষ্টিপাত করতে পারি :

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ॥

(কলিসন্তরণোপনিষদ্)

এই মন্ত্রে হরি, রাম ও কৃষ্ণ—এই তিন নাম আগে-পরে মোট ষোল বার বলা হয়েছে। এই মন্ত্র জপ করবার সময়ে ভগবান রাম, কৃষ্ণ ও হরির রূপের স্মরণ করা দরকার। এই নাম সাকার-নিরাকার উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য। বস্তুত এই নামসকল একমাত্র প্রভুরই, তাই তা জপ করবার সময়ে যিনি যার ইষ্ট তাঁর ধ্যানই করা উচিত। ভগবান রাম, কৃষ্ণ আর বিষ্ণু—তিনজনই অভিন্ন। তিনি সৃষ্টির সূচনায় ভগবান বিষ্ণু, ত্রেতায় ভগবান রাম আর দ্বাপরে ভগবান কৃষ্ণের নামে পরিচিত হন। এটিই তাঁর সগুণ সাকার দিব্যরূপ। তাঁর ধ্যান করা উচিত। জপ করবার সময়ে নিজের ইষ্টদেবের মূর্তি মনের সম্মুখে স্পষ্টভাবে আসা প্রয়োজন। নিরাকার ভাবে চিন্তা করলে অর্থ এইরূপ হয়—রাম শব্দের অর্থ সর্বত্র রমণকারী সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা যা অণু-

পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত বা যোগিগণ যাতে রমণ করে থাকেন।[১] কৃষ্ণ শব্দে কৃষ্ মানে সৎ আর 'ণ' মানে আনন্দ। যে আনন্দের কখনো অভাব হয় না এবং যে আনন্দ নিত্য অবিনাশী তাই কৃষ্ণ।[২] হরির অর্থ—যিনি সকল পাপ হরণ করেন এবং যা উচ্চারণ করলেই সকল পাপ ভস্মীভূত হয়ে যায়, তাই হরি। 'হরি' নাম নিলেই সকল পাপের অবলুপ্তি হয়।[৩] জপ করবার সময় এই সকল অর্থের উপর বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করতে হয়। এই বিশ্বাস ধারণ করা প্রয়োজন যে সর্বব্যাপী পরমাত্মাই এইরূপে আমার সম্মুখে এসেছেন। এইরূপ করলে অদ্ভুত শান্তি লাভ হয় অথবা জপ করবার সময়ে সতত নিজ ইষ্টমূর্তির ধ্যান করা উচিত। তখন যেন চিত্ত ধ্যানমগ্নই থাকে।

কোনো রকমের কামনা রাখা ঠিক নয়। ভক্ত প্রহ্লাদ বলেছেন—বর লাভ করবার ইচ্ছায় যে ভক্তি করে সে তো আসলে বণিক। যখন ভগবান বর প্রার্থনা করবার জন্য বারে বারে প্রহ্লাদকে বললেন তখন প্রহ্লাদ চাইলেন তাঁর

---

[১]রমন্তে যোগিনো যস্মিন্ নিত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনৈতৎপরং ব্রহ্মাভিধীয়তে।। (পদ্মপুরাণ)

যে নিত্যানন্দময় বোধস্বরূপ পরমাত্মাতে যোগিগণ রমণ করেন, তাই রাম—এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'রাম' পদ দ্বারা পরব্রহ্মের বোধ হয়।

[২]কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
বিষ্ণুস্তদ্ভাবযোগাচ্চ কৃষ্ণো ভবতি শাশ্বতঃ।।

(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ৭০।৫)

'কৃষ্' শব্দ সত্তাবাচক আর 'ণ' অক্ষর আনন্দবাচক। এই দুইভাব যুক্ত হওয়ায় সনাতন ভগবান বিষ্ণু সচ্চিদাময় শ্রীকৃষ্ণ নামে অভিহিত হন।

[৩]হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ।। (বৃ.না. ১।১১।১০০)

যাঁর চিত্ত বহু প্রকারের দোষে দূষিত এমন ব্যক্তিও যদি 'হরি' বলে ভগবানের স্মরণ করেন তাহলে ভগবান হরি তাঁর সমস্ত পাপ হরণ করে নেন ; কারণ অনিচ্ছাতেও যদি অগ্নিস্পর্শ হয় তা দগ্ধই করে (অর্থাৎ যেমন স্পর্শ লাভ করলেই দগ্ধ করা অগ্নির স্বভাব তেমন ভাবেই উচ্চারণ করলেই পাপসকল ভস্ম করা ভগবন্নামের স্বভাব)।

মনে যেন যাচনা করবার ইচ্ছাই না থাকে। চিন্ময় বিগ্রহ ও অর্থ ধারণ করে এমনভাবে নিষ্কাম হয়ে জপ করতে হয়। জপ—চলনে-বিশ্রামে, নিদ্রা-জাগরণে অবিরামভাবে সর্বকালে করা উচিত। প্রিয়বস্তুর স্মরণ করলেই চিত্তে প্রফুল্লতা ভরে ওঠে। অনুরাগে মুগ্ধ হয়ে ভগবানের নাম জপ ও স্বরূপের ধ্যান করতে হয়। অনুরাগ ও শ্রদ্ধা সমন্বিত নিষ্কামভাবে ও গুপ্তরূপে ধ্যান করে যে জপ করা হয় তা মহান ফলদায়ক হয়ে থাকে।

প্রীতি ও সমাদরযুক্ত নামজপে নিম্নোক্ত তিনটি থাকা প্রয়োজন—

(১) গুপ্ত হতে হবে।

(২) অর্থ জেনে করতে হবে।

(৩) নিষ্কামভাবে করতে হবে।

ধ্যানের সময় ভগবানের লীলা, গুণ, রহস্য ও প্রভাবের উপর যদি লক্ষ্য রাখা হয় তাহলে ধ্যানে এক বিচিত্র মাধুর্য অনুভূত হয়। প্রভু অবতার দেহধারণ করে যে প্রেমলীলা করেন তা সকলই আনন্দময় ও দিব্য হয়ে থাকে। সেই লীলা যাতে প্রেমানুরাগ অনুভূতি আছে—তা যদি ধ্যানের সময় অন্তর অধিকার করে বসে তাহলে তো ধ্যান ছাড়বার ইচ্ছাই হবে না কারণ সেই লীলাতে মন, চিত্ত, প্রাণ এত লীন থাকবে যে সেইখান থেকে সরে আসবার ইচ্ছাই হবে না। এই হল প্রকৃত ধ্যান আর তাতে পরিশ্রম করবার দরকার হয় না আর তা ছেড়ে উঠে পড়তেও ইচ্ছা হয় না। ভগবানের গুণ, প্রভাব ও রহস্য জানতে পারলেই প্রকৃত ধ্যান হয়ে থাকে।

ভগবানের গুণমহিমা সংকীর্তন কেমন করে সম্ভব ! তিনি তো গুণ সাগর। প্রভু প্রেমময়। প্রেমের বিগ্রহ। প্রেমই তাঁর স্বভাব। প্রভু দয়াময়। দয়ার প্রতিমূর্তি, দয়া করাই তাঁর স্বভাব। তাঁর এক একটি গুণের দিকে দৃষ্টি পড়লে দেখা যায় তিনি যেন সেই গুণের প্রতিমূর্তিই। সকল গুণেরই প্রভুর মধ্যে আধিক্য থাকে। এইভাবে তাঁর প্রভাবও অনন্ত। জগতে যার যা কিছু প্রভাব চোখে পড়ে তা সবই প্রভুর। অগ্নির দাহিকা শক্তি, সূর্যের জ্যোতি, চন্দ্রের শীতলতা ও পোষণশক্তি সব যদি একত্র করা হয় তাহলেও তা প্রভুর প্রভাবের এক অংশসম কদাচিৎ হয়। ভগবান গীতার দশম অধ্যায়ে নিজ বিভূতি বর্ণনা করে শেষকালে বলেছেন :

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥

(১০।৪১)

'যা যা ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন বা উৎসাহশালী—তা সকলই আমার শক্তির অংশ হতে অভিব্যক্ত বলে জানবে।'

প্রভুর সংকল্পে জগৎ সৃষ্ট হয় আর তার অবসানেই জগৎ লয় হয়। প্রভু সংকল্প মাত্রেই অসংখ্য জন্মের মহাপাপীরও সকল পাপ নিমেষেই ভস্ম হয়ে যায়। প্রভুর সংকল্পেই নিমেষে সমগ্র জগতের উদ্ধার হয়ে যাওয়া সম্ভব। শুধু সংকল্প কেন, প্রভুর সংকেত মাত্রেই, ইশারাতেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ধার হওয়া সম্ভব।

তাঁর দর্শন লাভ আর ধ্যানের কথা তো অনেক বড় কথা, প্রভুর স্মরণ করা মাত্রেই নিমেষেই মানুষ পবিত্র হতে পারে। কেবল তাই নয়, প্রভুর দয়ার প্রতাপে তাঁর নাম উচ্চারণ করেই মানুষ উদ্ধার হতে পারে—এমনই শাস্ত্রের বিধান আর সন্তদের অনুভব।

এখানে একটা প্রশ্ন ওঠা সম্ভব যে আজ এত লোকে তাঁর নাম নিচ্ছে আর তবুও কেন তাদের উদ্ধার হচ্ছে না ? তাহলে কী শাস্ত্রবিধান ও সন্তদের অনুভব অসত্য ? শাস্ত্র ও সন্ত তো কখনো অসত্য বলেন না। আমাদের উদ্ধার হয় না কারণ যেমনভাবে নাম নেওয়া উচিত, তেমনভাবে কেউ নাম নেয় না ; কেবল দায়সারা হিসেবে সংখ্যা পূর্ণ করবার জন্য ভজন করে। নামের প্রতি আমাদের চিত্তে যথার্থ শ্রদ্ধা নেই, অন্তরে সেই আকর্ষণ ও অনুরাগ, নিষ্কামভাব নেই, সমাদর বুদ্ধিও নেই।

পুনরায় প্রশ্ন উঠতে পারে যে তা যেমন শাস্ত্রকথন অনুসারে নাম যেমন ভাবেই নেওয়া হোক না কেন, অগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ যেমন ইন্ধন সমগ্র ভস্ম করে দেয়, ঠিক তেমনই একটি মাত্র নামজপ অসংখ্য পাপকে ভস্ম করতে সক্ষম। শাস্ত্রানুসারে নামের মহিমা এত বেশি তা বলে শেষ করা যায় না। সাধারণ জপেরও মহান ফল বলা হয়েছে। তাহলে আমাদের ঘাটতিটা কোথায় ?

ঘাটতি কেবল বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায়। নাম জপ কালেও আমরা নামের প্রভাব ও রহস্য অনুধাবন করি না তাই আমরা তাঁর মহিমাকে বুঝতে সক্ষম হই না। আমরা ভাবি যে এগুলি শাস্ত্রের অর্থবাদ অর্থাৎ শুধুই কথার কথা, অনুভব করে লেখা হয়নি। এই অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার জন্য আমরা পূর্ণ ফল লাভ করি না। এই অবিশ্বাসই আমাদের অপরাধ। যার পূর্ণ বিশ্বাস বর্তমান তার পূর্ণ ফল লাভ হয়। পরমেশ্বরের প্রভাব ও তত্ত্ব বুঝতে সক্ষম হলেই শ্রদ্ধা গভীর হয়। তার সঙ্গে অতুলনীয় অনুরাগও আসে। যে বিশ্বাস করে শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের প্রীতিপূর্বক নাম জপ করে তার প্রত্যক্ষ শান্তি ও আনন্দ লাভ হবেই।

এইভাবে নাম স্মরণ করলেই সকল পাপ ভস্ম হয়ে যায় আর সকল ফল স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। প্রভুর অসীম কৃপা, কিন্তু আমরা তা স্বীকার করি না। বিশ্বাস পাকা না হলে পূর্ণ ফলও লাভ হয় না। রহস্য উদ্‌ঘাটনে বিলম্ব হয় না, প্রভু কৃপা করে মুহূর্তেই জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করে দেন আর তখন নিজের অবিশ্বাস ও কাল্পনিক দারিদ্র্যের জন্য প্রবল অনুশোচনা হয় যে এতকাল এই মহিমা সম্বন্ধে অজ্ঞান ছিলাম কীভাবে ?

এক দরিদ্র ব্যক্তি ছিল। তার গৃহে এক সাধুর আগমন হল। সাধু 'নারায়ণ হরি' বলে হাঁক পাড়লেন। দরিদ্র গৃহের বাইরে এসে দেখল যে একজন সাধু ভিক্ষা পাওয়ার জন্য দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন। সে তখন ক্রন্দনশীল হয়ে অনুতাপ করে বলতে লাগল—মহাত্মা ! আমার সৌভাগ্য যে আপনার কৃপা করে আগমন হয়েছে। কিন্তু গৃহে তো এক দানা অন্নও নেই, প্রতিবেশীগণ আমায় কিছু দেবেনও না, বাজার থেকে কোনো বস্তু ধার করে আনব তারও সম্ভাবনাও নেই। তাই ভিক্ষা দানে আমি অপারগ আর ইচ্ছা থাকলেও আপনার সেবা করতে পারব না। জগতে আমার মতন দুঃখী কোথায় ? সাধু উত্তর দিলেন—জগতে তোমার মতন ভাগ্যবান সতত বিরল। দরিদ্র ব্যক্তির সাধুর কথার উপর বিশ্বাস হওয়ার কথা নয়। সাধু তখন ভিতরে ঢুকে এলেন আর শিলের উপর রাখা নোড়াকে তুলে জিজ্ঞাসা করলেন— 'এইটা কী ?' সেই দরিদ্র ব্যক্তি উত্তর দিল—'মহারাজ ! এটা তো একটা পাথর। এটা দিয়ে

আমি চাটনি তৈরি করি।' সাধু বললেন—'না, এটা তো পাথর নয় এটা পরশপাথর।' হতভাগ্য দরিদ্র দেখল যে, তা একটা পাথর ছাড়া আর কিছু নয়। সে কেমন করে সাধুর বক্তব্য বুঝবে ? সাধু বললেন—'বেশ, তুমি না হয় পরীক্ষা করে নাও আর তোমার গৃহে যত লোহার বাসন আছে নিয়ে এসো।' সেই দরিদ্রের গৃহে অল্প কিছু লোহার বাসন অবশিষ্ট ছিল। সে চাকু, খুন্তি, সাঁড়াশি, চিমটে, ছুরি নিয়ে এল। সেই নোড়া দিয়ে বস্তুসকল স্পর্শ করে দিতেই তা সোনার হয়ে গেল। তখন সাধু বললেন—'আরে, জগতে তো তুমি পরম ভাগ্যবান। তোমার সৌভাগ্যের শেষ নেই। তুমি ইচ্ছা করলে জগতের সকল লোহাকেই সোনা করে দিতে পার। তুমি না জেনে এই পরশ পাথর দিয়ে চাটনি বাটতে আর তুমি তাকে সাধারণ পাথর মনে করতে। আসলে তোমার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল। এখন তুমি সমগ্র জগতের দারিদ্র্য মোচন করতে পার। সমগ্র জগৎ প্রস্তর বললেও আমার দৃষ্টিতে তা পরশপাথর।' তারপর মুহূর্তের মধ্যেই সেই দরিদ্র ব্যক্তির দারিদ্র্যের অবসান হল, তার হুঁশ হল।

আমাদের অবস্থাও তেমনই। মূর্খসম পরশপাথর দিয়ে আমরা চাটনি বাটি। যখন জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন হয় তখন মুহূর্তের মধ্যেই আমরা পরশ পাথরের মূল্য বুঝতে পারি। তখন প্রাণ বিপন্ন করেও আমরা পরশ পাথরকে রক্ষা করি। এটি বুঝতে কত সময় লাগে ! প্রভুর কৃপায় আমাদের যখন জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন হয় তখন গৃহেই পড়ে থাকা — এতদিন পর্যন্ত তিরস্কৃত পরশপাথর পেয়ে আমাদের মূর্খতা ও তার জন্য উদ্ভূত দারিদ্র্যের উপর অনুশোচনা জাগে, প্রভুর রহস্য উদ্‌ঘাটনে এক মুহূর্তও লাগে না। তাই হল রহস্য। অজ্ঞানতার জন্য সে পরশপাথরকে পাথর মনে করেছিল। অজ্ঞানতা সরে যেতেই পরশপাথরের রহস্য উদ্‌ঘাটন হয়ে গেল। প্রভু বাইরে থেকে আসেন না। তিনি তো আগে থেকেই অন্তরে বিরাজমান, অজ্ঞানতার বশীভূত হয়ে আমরা তাঁর দিকে দেখি না, তাঁকে হারিয়ে বসে থাকি। প্রভুর মিলনও পরশপাথর লাভ করবার মতন—তিনি তো আমাদের গৃহেই বিরাজমান, অজ্ঞানতার বশীভূত হয়ে আমরা তাঁকে চিনতে পারি না। অজ্ঞান

সরে গেলেই আর অন্তর্দৃষ্টি লাভ হলেই আমরা দেখি নারায়ণ আমাদের সম্মুখেই বিরাজমান।

প্রভুর রহস্য সমাধানেই আমরা প্রভুর তত্ত্বকে জেনে যাই। লোহাকে সোনা করে দেওয়া তার প্রভাব। তত্ত্বজ্ঞানও এই যে পাথর নয়, তা হল পরশপাথর। পরশপাথরকে পরশপাথর রূপে জানাই তত্ত্বজ্ঞান হওয়া। তারপর তো সহজেই তাঁর উপর অগাধ মমতা, অসীম অনুরাগ এসে যায়।

পরশপাথর তো কেবল লোহাকে সোনা করে ; তা মুক্তি দান করতে সক্ষম নয়। প্রভুর নাম তো আমাদের ভবসাগর অতিক্রম করিয়েও দেয়। তাঁর গুণসকল মনে পড়লেই মনে হয় যেন তা অসীম। তখন তো এক মুহূর্তের জন্যও প্রভুকে ত্যাগ করা সম্ভব হয় না। দীনহীন যখন পরশপাথর পায় তখন সে তাকে প্রাণের থেকেও বেশি আপন করে নেয়। প্রভু তো অনন্ত গুণসাগর — তাকে লাভ করলে অবস্থা কেমন হবে আন্দাজ করুন ! সেই অনুরাগকে বর্ণনা করা বা সেই আনন্দ ও শান্তিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব ?

জপ করবার সময়ে এইভাবে প্রভুর গুণ, প্রভাব ও রহস্য জেনে জপ করা উচিত। গুপ্তরূপে, নিষ্কামভাবে আর অনুরাগে মুগ্ধ হয়ে এইভাবে প্রভুর ধ্যান করুন। এমন জপ মুহূর্তের জন্য হলেও অতিশয় লাভপ্রদ ও ফল প্রদায়ক হয়ে থাকে।

———o———